Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন ও হাদিসের আলোকে


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফয়েজিয়া হোসাইন রকসি

রোলঃ 23090120320


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন ও হাদিসের আলোকে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফয়েজিয়া হোসাইন রকসি

রোলঃ 23090120320

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন ও হাদিসের আলোকে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফয়েজিয়া হোসাইন রকসি, আইডিঃ 23090120320 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন ও হাদিসের আলোকে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**ফয়েজিয়া হোসাইন রকসি**

আইডিঃ 23090120320

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন ও হাদিসের আলোকে.....8

অধ্যায় ১- ভূমিকা.....8

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট:.....8

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য:.....8

১.৩ গবেষণার তাৎপর্য:.....8

১.৪ গবেষণার সীমা ও সীমাবদ্ধতা:.....9

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি:.....9

অধ্যায় ২- সুখের ধারণা ও সংজ্ঞা.....10

২.১ সুখের সাধারণ অর্থ:.....10

২.২ সুখ সম্পর্কে দার্শনিক ও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতামত বনাম ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:
.....11

২.৩ আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সুখ:.....13

২.৪ ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে সুখ.....15

২.৫ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুখের সংজ্ঞা.....17

২.৬ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি: তুলনামূলক বিশ্লেষণ.....18

অধ্যায় ৩- কোরআনের আলোকে প্রকৃত সুখ.....20

৩.১ আল্লাহর স্মরণ ও অন্তরের প্রশান্তি.....20

৩.২ তাকওয়া ও সৎকর্ম.....23

৩.৩ : ধৈর্য্য (সবর) ও কৃতজ্ঞতা (শুকর): প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি.....26

৩.৪: ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি (সালাত, যাকাত, রোজা, হজ).....31

৩.৫. ন্যায়বিচার ও সততা — প্রকৃত সুখের সামাজিক ও আত্মিক ভিত্তি.....34

৩.৬ আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি — প্রকৃত সুখের চূড়ান্ত ভিত্তি.....37

অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে প্রকৃত সুখ.....41

৪.১ অন্তরের সমৃদ্ধিই প্রকৃত সম্পদ.....41
৪.২ কানাআত (সন্তুষ্টি) — প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি.....44
৪.৩ : সত্যিকার ধনী কে? (হাদীসের আলোকে).....46
৪.৪ : ইহকাল ও পরকালীন ভারসাম্য (হাদীসের আলোকে).....49
৪.৫ : পারিবারিক সম্পর্ক ও সুখ (পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান).....51
৪.৬ : সৎ সঙ্গ ও নৈতিক জীবন.....54
অধ্যায় ৫- ইসলাম-পূর্ব যুগ বনাম ইসলামের দৃষ্টিকোণ.....57
৫.১ জাহেলিয়াত যুগে সুখের ধারণা.....57
৫.২: ইসলাম আগমনের পর নতুন সংজ্ঞা.....59
৫.৩: রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের জীবন থেকে উদাহরণ.....61
৫.৪ ইতিহাসে মুসলিম সমাজে সুখের ধারণা.....64
৫.৫. ইতিহাসিক কেস-স্টাডি (সংক্ষিপ্ত): আব্বাসিদ/ওটোমান/মুঘল বাস্তবতা.....67
অধ্যায় ৬: আধুনিক যুগে সুখের ধারণা ও ইসলামের সমাধান.....75
৬.১ আধুনিক সমাজে সুখ -অর্থ, খ্যাতি, ভোগবিলাস.....75
৬.২ আধুনিক সমস্যাবলি — মানসিক চাপ, একাকীত্ব, বিষণ্নতা.....76
৬.৩ ইসলামের সমাধান → আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, দয়া ও ভ্রাতৃত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ.....79
৬.৪ মনোবিজ্ঞান বনাম ইসলামী শিক্ষা — একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ.....82
অধ্যায় ৭: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ.....86
৭.১ ব্যক্তিগত জীবন → তাকওয়া, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি.....86
৭.২ পারিবারিক জীবনে সুখ: দাম্পত্য শান্তি ও পিতা-মাতার খেদমত.....88
৭.৩ সামাজিক জীবনে সুখ: ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, যাকাত ও দান.....89
৭.৪: রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ — ন্যায়নিষ্ঠ শাসক ও সামাজিক সমতা.....91
৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি.....93
অধ্যায় ৮: আত্মশুদ্ধি ও সুখের সম্পর্ক.....95

৮.১ আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা ..... 95
৮.২ আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ..... 98
৮.৩ অন্তরের রোগ (হিংসা, অহংকার, লোভ, রিয়া) ..... 99
৮.৪ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রশান্তি ..... 101
৮.৫ ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্য আলিমদের মতামত ..... 103
অধ্যায় ৯: তুলনামূলক বিশ্লেষণ ..... 105
৯.১ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামের সুখ ধারণা ..... 105
৯.২ মনোবিজ্ঞান ও ইসলামী আত্মশিক্ষার তুলনা ..... 109
৯.৩ ইসলামী সুখ ধারণার সার্বজনীনতা ..... 110
৯.৪ বস্তুবাদ বনাম আধ্যাত্মিকতা ..... 112
৯.৫ সুখের মডেল বনাম সেকুলার সুখের মডেল ..... 114
অধ্যায় ১০: উপসংহার ও সুপারিশ ..... 118
মূল বক্তব্য: প্রকৃত সুখ = আল্লাহর স্মরণ ও তাকওয়া ..... 118

# মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়? - কোরআন  ও হাদিসের আলোকে

## অধ্যায়  ১- ভূমিকা

### ১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট:

মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিক, মনীষী ও সমাজবিজ্ঞানীরা সুখের সংজ্ঞা নির্ধারণে চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন সুখ হলো ভোগবিলাস, কেউ বলেছেন খ্যাতি ও ক্ষমতা, আবার কেউ বলেছেন মানসিক প্রশান্তি। আধুনিক সভ্যতা বস্তুগত উন্নতি ও প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জন করলেও মানুষের অন্তরে যে শূন্যতা, অশান্তি ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করছে, তা প্রকৃত সুখের অভাবকেই প্রকাশ করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

**“যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে যাদের অন্তর শান্তি লাভ করে, জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে।”(সূরা রা'দ: ২৮)**

এভাবেই ইসলাম স্পষ্ট করেছে, প্রকৃত সুখ বস্তুগত অর্জনে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যেই নিহিত।

### ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো—কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ।ইসলামের সুখ ধারণা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সুখ ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা।ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রকৃত সুখ অর্জনের উপায়গুলো তুলে ধরা।আধুনিক যুগের মানসিক সংকট ও অশান্তির সমাধান ইসলামী শিক্ষায় কীভাবে নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ করা।

**রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:**

**“ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নয়, প্রকৃত সম্পদ হলো অন্তরের সমৃদ্ধি।”(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে সুখ বাহ্যিক সম্পদে নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তিতে নিহিত।

### ১.৩ গবেষণার তাৎপর্য:

মানুষ আজ বস্তুগত উন্নতির শীর্ষে পৌঁছালেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে দিন দিন অস্থিরতায় ভুগছে। আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, পারিবারিক ভাঙন এবং সামাজিক অন্যায়-অশান্তি প্রমাণ করে যে, প্রকৃত সুখ এখনো অধরাই রয়ে গেছে।

**কুরআন স্পষ্টভাবে বলে:**

**“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী—যদি সে মুমিন হয় তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের উত্তম কাজের প্রতিদান অবশ্যই দেব।”(সূরা নাহল: ৯৭)**

অতএব এই গবেষণার তাৎপর্য হলো প্রকৃত সুখের সেই ইসলামী ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, যা মানবতার সংকট নিরসনে অপরিহার্য।

### ১.৪ গবেষণার সীমা ও সীমাবদ্ধতা:

এই গবেষণার ক্ষেত্র মূলত কুরআন, সহিহ হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামি গ্রন্থাবলি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও আধুনিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থাকলেও মূল জোর দেওয়া হবে ইসলামি উৎসের ওপর। সময় ও সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে সব ধরনের মতবাদ বা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশদভাবে আলোচিত করা সম্ভব হবে না।

**হাদিসে এসেছে:**

**“জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”(সুনান ইবনে মাজাহ)**

এই নীতির আলোকে সীমিত জ্ঞানের আলোচনাই এখানে উপস্থাপিত হবে।

### ১.৫ গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন মাজিদ ও সহিহ হাদিস সংগ্রহ করা হবে এবং প্রখ্যাত ইসলামি আলেমদের ব্যাখ্যা থেকে উপাত্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি ইসলামি চিন্তাবিদদের গ্রন্থ, সাম্প্রতিক গবেষণাপত্র ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ব্যবহার করা হবে।

**কুরআনে আল্লাহ বলেন:**

**“তুমি বল, জ্ঞানী আর অজ্ঞ কি সমান?”(সূরা যুমার: ৯)**

অতএব, গবেষণার পদ্ধতিও হবে জ্ঞান অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

# অধ্যায় ২- সুখের ধারণা ও সংজ্ঞা

২.১ সুখের সাধারণ অর্থ:

## অভিধানগত অর্থ

“সুখ” শব্দটি বাংলা ভাষায় মূলত বোঝায়— আরাম, শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ এবং অন্তরের প্রশান্তি। ইংরেজি “Happiness” শব্দের অর্থ হলো আনন্দ, সন্তুষ্টি, আনন্দঘন অবস্থা বা সন্তুষ্টির অনুভূতি। দুঃখের বিপরীত শব্দ হিসেবেই সাধারণত সুখ ব্যবহৃত হয়।

"সুখ" একটি সার্বজনীন শব্দ, যা প্রতিটি মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে। দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা সুখকে কেউ ভোগবিলাস, কেউ মানসিক প্রশান্তি, কেউ আবার সাফল্য ও সম্মানের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণত সুখ বলতে বোঝায়—অন্তরের তৃপ্তি, মানসিক শান্তি এবং জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার অনুভূতি। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের আলোকে দেখা যায়, প্রকৃত সুখ বাহ্যিক সম্পদ, ভোগ বা সাময়িক আনন্দে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত, তাকওয়া ও আখিরাতের সফলতার সঙ্গে জড়িত

## দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

প্রাচীন দর্শনে সুখকে জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য বা “Ultimate Goal” হিসেবে ধরা হয়েছে। যেমন: অ্যারিস্টটল সুখকে বলেছিলেন “Eudaimonia” অর্থাৎ মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও নৈতিক উৎকর্ষ।

এপিকিউরাস সুখকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন ইন্দ্রিয়ের আনন্দ আর দুঃখের অনুপস্থিতি হিসেবে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সুখকে প্রায়ই “মানসিক সুস্থতা” (Well-being) এবং “সন্তুষ্টি” হিসেবে দেখা হয়।

তবে এসব দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা আছে, কারণ এগুলো মূলত পার্থিব জীবনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

## মানুষের জীবনে সুখের প্রয়োজন

প্রত্যেক মানুষই সুখ চায়। কেউ অর্থ-সম্পদে সুখ খোঁজে, কেউ ভোগবিলাসে, কেউ সম্পর্ক বা ক্ষমতায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এসব উপকরণ সাময়িক প্রশান্তি দিলেও চিরস্থায়ী সুখ এনে দিতে পারে না। **কুরআনের আলোকে সুখ**

কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃত সুখকে অন্তরের প্রশান্তি ও আল্লাহর স্মরণে শান্তি লাভ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

**আল্লাহ তায়ালা বলেন:**

**“যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে যাদের অন্তর শান্তি লাভ করে, জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে।”(সূরা রা’দ: ২৮)**

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে, অন্তরের আসল প্রশান্তি বা সুখ আল্লাহর স্মরণ ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

**আবার কুরআনে এসেছে:**

**“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী—যদি সে মুমিন হয় তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের উত্তম কাজের প্রতিদান অবশ্যই দেব।”(সূরা নাহল: ৯৭)**

এখানে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ঈমান ও সৎকর্মের ফলেই মানুষ দুনিয়ায় প্রশান্ত জীবন (profound happiness) পাবে।

**হাদিসের আলোকে,**

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:**

**“ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নয়, প্রকৃত সম্পদ হলো অন্তরের সমৃদ্ধি।”(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)**

অর্থাৎ, বস্তুগত সম্পদ কখনোই প্রকৃত সুখ দিতে পারে না; বরং অন্তরের তৃপ্তিই প্রকৃত সম্পদ বা সুখ।

**অন্য হাদিসে এসেছে:**

**“যে ব্যক্তি সকাল বেলা নিরাপদ থাকবে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে এবং তার দিনের খাদ্য তার কাছে থাকবে, তবে যেন সে পুরো দুনিয়া লাভ করল।”(সুনান তিরমিজি, মুসনাদ আহমাদ)**

এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে, মৌলিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও রিজিক মানুষের জন্য যথেষ্ট সুখের উপাদান।সুতরাং, সাধারণ অর্থে সুখকে মানুষ যদিও ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, ইসলাম এটিকে আল্লাহর স্মরণ, ইমান, সৎকর্ম এবং অন্তরের প্রশান্তির সঙ্গে যুক্ত করেছে। বাহ্যিক অর্জন মানুষকে সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সুখ একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টিতেই নিহিত।

### ২.২ সুখ সম্পর্কে দার্শনিক ও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতামত বনাম ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি:

**পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি**

পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা সুখকে (Happiness / Eudaimonia) নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেছেন। তবে তাদের অধিকাংশ ধারণাই মূলত মানব জীবনের ইহলৌকিক দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

**ক. প্রাচীন দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি:**

**◑সক্রেটিস (Socrates) :** তাঁর মতে, সুখ মানে হলো নৈতিক জীবনযাপন। আত্মসংযম ও সৎ জীবনযাপন করলে মানুষ প্রকৃত সুখ পেতে পারে।

**◑প্লেটো (Plato) :** তিনি মনে করতেন, সুখ আসে জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুগত ভোগ নয়, বরং সত্য ও জ্ঞানের অন্বেষণই মানুষকে সুখী করে।

**◑এরিস্টটল (Aristotle) :** সুখকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন Eudaimonia অর্থাৎ "মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ" হিসেবে। তিনি বলেছিলেন, মানুষ যখন নিজের সামর্থ্য ও গুণাবলিকে পূর্ণভাবে কাজে লাগায়, তখনই প্রকৃত সুখ লাভ করে।

**খ. হেলেনিস্টিক দর্শন:**

**◑এপিকিউরাস (Epicurus) :** সুখকে দেখেছেন দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হিসেবে। তিনি বলেছেন, সামান্য ভোগে সন্তুষ্ট থাকলেই সুখী হওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে তাঁর অনুসারীরা ভোগবাদে ঝুঁকে যায়।

**◑স্টোয়িকরা (Stoics) :** সুখ মানে হলো প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপন ও ভাগ্যের প্রতি ধৈর্যশীল থাকা। তারা মনে করতেন, সুখ বাইরের জিনিসে নয়, বরং অন্তরের মানসিক দৃঢ়তায়।

**গ. মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য ধারণা:**

খ্রিস্টান চিন্তাধারায় সুখকে আখিরাতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। যেমন, সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন— "মানুষের অন্তর কখনো শান্ত হবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়।"

তবে পাশ্চাত্যে এই আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে বিজ্ঞানের বিকাশ ও ধর্মবিরোধী আন্দোলনের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে।

**ঘ. আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি:**

**◑উপযোগবাদ (Utilitarianism – জেরেমি বেনথাম, জন স্টুয়ার্ট মিল) :** সুখ মানে আনন্দের পরিমাণ বেশি হওয়া এবং দুঃখ কম হওয়া। সমাজে যে কাজ আনন্দ বাড়ায় সেটাই ভালো।

**◑ভোগবাদ (Hedonism) :** সুখ হলো ভোগ ও আনন্দ উপভোগ। যত বেশি ভোগ, তত বেশি সুখ।

**◑আধুনিক মনোবিজ্ঞান :** সুখকে মানসিক তৃপ্তি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাফল্য, ক্যারিয়ার, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

### ঙ. পাশ্চাত্যের সীমাবদ্ধতা:

যদিও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে সুখকে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তবে এর প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

- বেশিরভাগ মতবাদ আখিরাতকে অস্বীকার করেছে।
- সুখকে বস্তুবাদী ভোগ ও সাময়িক আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করেছে।
- প্রযুক্তি ও সম্পদে উন্নত সমাজেও মানসিক অশান্তি, একাকিত্ব, হতাশা, আত্মহত্যা বেড়ে যাচ্ছে— যা প্রমাণ করে পাশ্চাত্য সুখ ধারণা মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে ব্যর্থ।

২.৩ আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সুখ:

### ক. ভোগবাদী সুখের উৎপত্তি:

বিশ্বায়ন, শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ভোক্তাবাদী অর্থনীতি আধুনিক সমাজে সুখের ধারণাকে পরিবর্তন করেছে। সুখকে এখন মূলত বস্তুগত অর্জন ও ভোগের স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হয়।বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া মানুষের মনে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছে যে, সুখ মানে হলো— বিলাসবহুল বাড়ি, দামি পোশাক, দামী গাড়ি, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি।

সমাজতত্ত্ববিদ হার্বার্ট মার্কুস বলেন, আধুনিক শিল্পসমাজ মানুষকে "One-Dimensional" করে ফেলেছে, যেখানে সুখ কেবল ভোগে সীমাবদ্ধ।

### খ. আধুনিক সমাজে সুখের বৈশিষ্ট্য:

- **অর্থকেন্দ্রিকতা** – টাকা থাকলেই সুখ আছে, এই বিশ্বাস। ধনীদের প্রতি ঈর্ষা ও দরিদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা এর ফল।
- **ভোগবিলাস ও ভোক্তাবাদ** – বেশি কেনা, বেশি খাওয়া ও বেশি ব্যবহার করাকেই আনন্দ মনে করা।
- **তুলনামূলক সুখ** – অন্যের চেয়ে বেশি অর্জন করলে সুখ, কম হলে অসুখ।
- **সাময়িকতা** – বস্তুগত আনন্দ স্থায়ী নয়। নতুন কিছু অর্জন করলে কিছু সময় সুখ আসে, তারপর আবার শূন্যতা।
- **বস্তুবাদী প্রতিযোগিতা** – আজকের সমাজে "যত বেশি আছে, সে তত সুখী" – এই প্রতিযোগিতাই অস্থিরতার মূল।

### গ. ভোগবাদী সুখের সামাজিক প্রভাব:

- **পারিবারিক ভাঙন:** বস্তুগত অর্জনের দৌড়ে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।
- **অপরাধ বৃদ্ধি:** ভোগবিলাস মেটাতে চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা বাড়ছে।

- **মানসিক চাপ:** আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, ভোগবাদী মানসিকতা বিষণ্ণতা, উদ্বেগ ও একাকিত্ব বাড়ায়।
- **পরিবেশগত সংকট:** মানুষের সীমাহীন ভোগ প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ডেকে এনেছে।

**ঘ. কুরআনের আলোকে ভোগবাদী সুখের সীমাবদ্ধতা:**

কুরআন বারবার বলেছে— দুনিয়ার ভোগবিলাস সাময়িক, আখিরাতের জীবনই চিরস্থায়ী।

**"তোমরা যা কিছু পেয়েছো, তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ মাত্র; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, সেটাই উত্তম ও স্থায়ী।"(সুরা আশ-শূরা, ৪২:৩৬)**

**"দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া ও খেলাধুলা ছাড়া কিছু নয়; আর পরকালের ঘরই প্রকৃত জীবন— যদি তারা জানত।"(সুরা আনকাবুত, ২৯:৬৪)**

**ঙ. হাদিসে ভোগবাদী সুখের অসারতা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের চাহিদার অসীমতা সম্পর্কে বলেছেন:

**"আদম সন্তান যদি একটি উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ পেত, তবে সে দ্বিতীয়টির কামনা করত। আর তার পেট ভরবে কেবল মাটি দিয়ে। আল্লাহ যার অন্তরকে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করে দেন, সে-ই প্রকৃত ধনী।"(সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম)**

অন্য হাদিসে তিনি বলেন:

**"পৃথিবী হলো ভোগের সামগ্রী, আর পৃথিবীর সেরা ভোগ হলো নেককার স্ত্রী।"(সহিহ মুসলিম)**

অর্থাৎ, দুনিয়ার সব বস্তুই সাময়িক, তবে প্রকৃত সুখ আসে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ জীবনযাপনে।

**চ. আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ:**

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অর্থ একটি পর্যায় পর্যন্ত সুখ দেয়, কিন্তু মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হলে অতিরিক্ত সম্পদ সুখ বাড়ায় না। যেমন: ড্যানিয়েল কানেম্যান ও অ্যাঙ্গাস ডিয়েটন (নোবেলজয়ী) তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পর অর্থ আর মানুষের সুখে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না।

**ছ. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সুখের বিকল্প:**

আল্লাহর স্মরণে অন্তরের প্রশান্তি:

**"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"(সুরা রা'দ, ১৩:২৮)**

ঈমান, ইবাদত ও তাকওয়া:

**“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী—আর সে মুমিন হলে আমি তাকে নিশ্চয়ই পবিত্র**

**জীবন দান করবো।”(সুরা নাহল, ১৬:৯৭)**

**জ. উপসংহার**:আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সুখ মানে সাময়িক ভোগ ও বস্তুগত অর্জন। কিন্তু তা স্থায়ী শান্তি আনে না, বরং অস্থিরতা ও মানসিক চাপ তৈরি করে। কুরআন-হাদিস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে— প্রকৃত সুখ হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি, অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহর স্মরণ ও আখিরাতের মুক্তিতে নিহিত।

২.৪ ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে সুখ

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজকে বলা হয় জাহেলিয়াত যুগ। “জাহেলিয়াত” অর্থ অজ্ঞতা, অশান্তি ও নৈতিক পতন। তখনকার সমাজে প্রকৃত সুখ ও শান্তি অনুপস্থিত ছিল। সুখ বলতে তারা বুঝত ধন-সম্পদ, গোত্রশক্তি, মদ-মত্ততা, ভোগবিলাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা। কিন্তু এসবই ছিল অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী এবং এসব সমাজে অন্যায়-অবিচার ছড়িয়ে দিত।

**ক. ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে সুখের ধারণা**

- **বস্তুগত সুখ:** তখনকার আরবরা ধন-সম্পদ ও সন্তানকে সুখ ও সম্মানের প্রতীক মনে করত।কুরআনে এসেছে:

**“তারা বলে, ‘আমাদের সম্পদ ও সন্তান বেশি, তাই আমরা শাস্তি পাব না।’” (সুরা সাবা, ৩৪:৩৫)**

অর্থাৎ, তারা সুখকে আল্লাহর আনুগত্যে নয় বরং ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাবশালী অবস্থানে খুঁজত।

- **মদ ও জুয়া:** মদপান, জুয়া খেলা এবং নেশাগ্রস্ততা ছিল আনন্দ ও সুখের বড় মাধ্যম।কুরআনে ইসলাম আগমনের পর এগুলোকে স্পষ্টভাবে শয়তানি কাজ বলে নিন্দা করা হয়েছে:

**“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্যনির্ধারণী শর হলো শয়তানের অপবিত্র কাজ। তাই এগুলো থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।” (সুরা মায়িদা, ৫:৯০)**

- **বংশগৌরব ও অহংকার:** গোত্র ও বংশের গৌরবকে তারা সুখের আসল মাপকাঠি মনে করত। ধনী ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা হতো। দরিদ্র, অনাথ ও দাসদেরকে তারা তুচ্ছ করত।

- **নারী অবমাননা:** নারীকে তখন সম্মানের স্থানে নয় বরং অবমূল্যায়নের জায়গায় রাখা হতো। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লজ্জা পেয়ে অনেকে জীবন্ত কবর দিত। তারা মনে করত, কন্যাসন্তান থেকে মুক্তিই সুখ।

কুরআন এ নিষ্ঠুরতা নিন্দা করেছে:

**"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ চেপে থাকে। সে লজ্জায় লোকদের থেকে আত্মগোপন করে—সে কি তাকে অপমানে রাখবে, না মাটিতে চাপা দেবে? জেনে রাখ, তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট!"(সুরা নাহল, ১৬:৫৮-৫৯)**

- **ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও মূর্তিপূজা:** তারা অসংখ্য দেব-দেবীর উপাসনা করত। ধারণা ছিল, সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় দেবতাদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে। ফলে কাবার চারপাশে শত শত মূর্তি বসানো ছিল।

**খ. ইসলাম-পূর্ব সুখের সীমাবদ্ধতা**

এসব সুখ আসলে প্রকৃত সুখ ছিল না, বরং সমাজে অস্থিরতা বাড়াত।

- ধনীরা সুখ ভোগ করত, গরিবরা বঞ্চিত থাকত।
- নারীরা ছিল শোষিত ও অবহেলিত।
- গোত্রবাদের কারণে যুদ্ধ ও রক্তপাত চলত।
- ধর্মীয় বিভ্রান্তি মানুষের অন্তরের শান্তি কেড়ে নিত

ফলে এ সমাজে প্রকৃত প্রশান্তি ও স্থায়ী সুখ ছিল অনুপস্থিত।

**গ. ইসলামের আগমন ও সুখের নতুন ধারণা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনের পর ইসলাম সুখের নতুন সংজ্ঞা দিল—

- প্রকৃত সুখ কেবল আল্লাহর আনুগত্যে।
- ধন-সম্পদ, সন্তান বা গোত্র নয়; সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তি ও ঈমানের শক্তি।
- নারীকে দেওয়া হলো মর্যাদা ও অধিকার।
- মদ, জুয়া, অশ্লীলতা—এসব নিষিদ্ধ করা হলো।
- আখিরাতকে সুখের আসল গন্তব্য বলা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা ধনসম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।" (সহিহ মুসলিম)**

**ঘ. উপসংহার**

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে সুখ ছিল বাহ্যিক, পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী। ধন-সম্পদ, গোত্রগৌরব, নারী অবমাননা ও ভোগবিলাস ছিল সুখের মাপকাঠি। কিন্তু এগুলো মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনতে পারেনি। ইসলাম এসে মানুষের দৃষ্টি ফেরাল প্রকৃত সুখের দিকে—যা হলো আল্লাহর আনুগত্য, নৈতিক উৎকর্ষ, মানবসেবা এবং আখিরাতের মুক্তি।

২.৫ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুখের সংজ্ঞা

**ক. ভূমিকা:**

ইসলামে সুখকে শুধু পার্থিব আনন্দ বা বস্তুগত ভোগ-বিলাস হিসেবে দেখা হয় না। বরং এটি হলো আত্মার প্রশান্তি, অন্তরের শান্তি এবং আল্লাহর আনুগত্যে সন্তুষ্টি। সুখের আসল কেন্দ্র হলো ঈমান, তাকওয়া, নেক আমল এবং আখিরাতের মুক্তি।

**খ. ইসলামে সুখের মূল ধারণা:**

- **আল্লাহর আনুগত্যই সুখের উৎস**

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

**“যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, আর সে মুমিন হলে আমি অবশ্যই তাকে সুন্দর জীবন দান করব।” (সুরা নাহল, ১৬:৯৭)**

এ আয়াত প্রমাণ করে, প্রকৃত সুখ নির্ভর করে ঈমান ও সৎকর্মের উপর, ধন-সম্পদ বা বাহ্যিক অবস্থার উপর নয়।

- **অন্তরের প্রশান্তিই প্রকৃত সুখ**

আল্লাহ বলেন:

**“জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে।” (সুরা রা'দ, ১৩:২৮)**

অর্থাৎ মানুষের আসল সুখ ধন, ক্ষমতা বা খ্যাতিতে নয়, বরং আল্লাহর জিকির ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার মধ্যেই।

- **দুনিয়ার সুখ সাময়িক, আখিরাতের সুখ স্থায়ী**

ইসলামে বলা হয়েছে, দুনিয়ার সুখ অস্থায়ী এবং পরীক্ষার অংশ। আসল সুখ হলো জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন।

কুরআনে বলা হয়েছে:

**“যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সাফল্য (সুখ) তারই।” (সুরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫)**

**গ. হাদিসের আলোকে সুখ:**

- **প্রকৃত সম্পদ ও সুখ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**“ধনসম্পদের প্রাচুর্যেই সম্পদ নয়; বরং প্রকৃত সম্পদ হলো অন্তরের সমৃদ্ধি।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)**

অর্থাৎ সুখ বাহ্যিক প্রাচুর্যে নয়, বরং অন্তরের তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিতে।

- **আল্লাহকে স্মরণকারীই সুখী**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**“যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে না—তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের মতো।” (সহিহ বুখারি)**

এ হাদিসে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহর জিকিরই মানুষের অন্তরে জীবন ও সুখ নিয়ে আসে।

**ঘ. ইসলামী সুখের বৈশিষ্ট্য:**

- **আধ্যাত্মিক সুখ** – আল্লাহর ইবাদতে প্রশান্তি।
- **নৈতিক সুখ** – সত্য, ন্যায় ও সৎকর্মে আনন্দ।
- **সামাজিক সুখ** – অন্যকে সাহায্য করার মাধ্যমে প্রকৃত সুখ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

**“মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে মানুষের জন্য বেশি উপকারী।” (মু’আত্তা মালিক)**

- **আখিরাতমুখী সুখ** – জান্নাত লাভের আশাই চূড়ান্ত সুখ।

**ঙ. উপসংহার:**

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুখ হলো—

- আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা
- তাকওয়ার জীবন যাপন করা
- সৎকর্মে অটল থাকা
- অন্তরে তৃপ্তি ও আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি খোঁজা
- আর সর্বোপরি আখিরাতে জান্নাত লাভ করা

অতএব, ইসলামের সংজ্ঞায় সুখ হলো সাময়িক ভোগ নয়; বরং এটি আধ্যাত্মিক শান্তি, নৈতিক উৎকর্ষ ও আখিরাতের মুক্তির সমন্বয়।

### ২.৬ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুখের ধারণা নিয়ে পাশ্চাত্য ও ইসলামী চিন্তাধারায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সুখকে মূলত দুনিয়াবি ও বস্তুগত দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, পক্ষান্তরে ইসলাম সুখকে দেখেছে আল্লাহর আনুগত্য ও আখিরাতের মুক্তির আলোকে। নিচে এ বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো—

**ক. সুখের উৎস:**

**পাশ্চাত্য :** সুখের উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে ভোগ, আনন্দ, জ্ঞানচর্চা বা সামাজিক সাফল্য। এরিস্টটল "গুণাবলি বিকাশে" সুখ দেখেছেন, আবার এপিকিউরাস সুখকে ভোগ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

**ইসলাম :** সুখের উৎস হলো আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য।

**খ. সুখের স্থায়িত্ব:**

**পাশ্চাত্য :** সুখকে অনেক সময় সাময়িক আনন্দ বা মানসিক সন্তুষ্টি হিসেবে দেখা হয়। যেমন, উপযোগবাদ (Utilitarianism) বলে বেশি আনন্দ মানেই বেশি সুখ। কিন্তু এ সুখ ক্ষণস্থায়ী, তাই হতাশা ও একাকিত্ব থেকেই যায়।

**ইসলাম :** সুখকে দেখা হয় স্থায়ী দৃষ্টিতে। দুনিয়ার আনন্দকে ক্ষণস্থায়ী বলা হয়েছে— **"এ দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলা ও বিনোদন মাত্র, আখিরাতের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন" (সূরা আনকাবুত: 64)।**

**গ. দুনিয়া বনাম আখিরাত:**

**পাশ্চাত্য :** অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তায় আখিরাতের কোনো ধারণা নেই। সুখকে পুরোপুরি দুনিয়াবি সাফল্য, সম্পদ, স্বাধীনতা বা ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

**ইসলাম :** সুখের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আখিরাতের মুক্তি।

রাসূল ﷺ বলেছেন— **"যে আখিরাতকে বড় চিন্তা বানায়, আল্লাহ তার হৃদয়কে ধনী করে দেন" (ইবন মাজাহ: 4105)।**

**ঘ. সুখের সংজ্ঞা:**

**পাশ্চাত্য :** সুখ মানে হচ্ছে আনন্দ (pleasure), দুঃখহীনতা বা মানসিক স্বস্তি।

**ইসলাম :** সুখ মানে হলো অন্তরের প্রশান্তি, তাকওয়া, সৎকর্ম ও আখিরাতে জান্নাতের প্রতিদান।

**ঙ. ফলাফল ও সীমাবদ্ধতা:**

**পাশ্চাত্য :** উন্নত ভোগবাদী সমাজেও হতাশা, একাকিত্ব, ডিপ্রেশন, আত্মহত্যার হার বেড়ে চলেছে। এটা প্রমাণ করে যে বস্তুগত সুখ স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না।

**ইসলাম :** ইসলাম মানুষকে এমন জীবনব্যবস্থা দিয়েছে, যেখানে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। ফলে মানুষ অন্তরে শান্তি ও প্রকৃত সুখ পায়।

**চ. সারসংক্ষেপ:**

পাশ্চাত্যে সুখকে মূলত দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, স্বাধীনতা বা আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম শিখিয়েছে যে প্রকৃত সুখ নিহিত আছে আল্লাহর স্মরণ, সৎকর্ম, তাকওয়া এবং আখিরাতের মুক্তিতে। তাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অধিক সর্বজনীন, গভীর ও স্থায়ী।

**উপসংহার**

মানুষ প্রকৃত সুখের সন্ধানে যুগে যুগে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সুখকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন— কেউ বলেছেন ভোগই সুখ, কেউ বলেছেন গুণাবলি বিকাশই সুখ, আবার কেউ বলেছেন জ্ঞানই প্রকৃত সুখ। তবে এসব ধারণার মূল সীমাবদ্ধতা হলো এগুলো কেবল দুনিয়াবি জীবনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। ফলে বস্তুগত উন্নয়ন, স্বাধীনতা কিংবা সামাজিক মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা সমাজে হতাশা, একাকিত্ব, মাদকাসক্তি ও আত্মহত্যার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

অন্যদিকে ইসলাম সুখকে সাময়িক ভোগ-বিলাসে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং আল্লাহর আনুগত্য, অন্তরের প্রশান্তি এবং আখিরাতের মুক্তিকে প্রকৃত সুখ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কোরআন বলেছে— "আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি পায়" (সূরা রা'দ: 28)। রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন— প্রকৃত সম্পদ ধন-সম্পদ নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তি।

অতএব বলা যায়, প্রকৃত সুখ কোনো ভৌত অর্জন নয়, বরং এটি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন লাভ। ইসলাম মানুষকে দুনিয়ার দায়িত্ব ও আখিরাতের প্রস্তুতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষকে অন্তরে প্রশান্তি, জীবনে লক্ষ্য ও মৃত্যুর পর প্রকৃত সফলতা প্রদান করে।

## অধ্যায় ৩- কোরআনের আলোকে প্রকৃত সুখ

### ৩.১ আল্লাহর স্মরণ ও অন্তরের প্রশান্তি

**ক. ভূমিকা:**

মানুষের অন্তরের প্রশান্তি বা "inner peace" সব যুগেই সবচেয়ে বড় চাহিদা। কেউ এই শান্তি খোঁজে ধন-সম্পদে, কেউ ক্ষমতায়, আবার কেউ আনন্দ-বিলাসে। কিন্তু এগুলো সাময়িক আনন্দ দেয়; স্থায়ী শান্তি দেয় না।

ইসলাম শিক্ষা দেয়—আত্মার প্রকৃত শান্তি ও সুখ কেবল আল্লাহর স্মরণ (জিকির) এবং তাঁর নিকটত্বে নিহিত।

**খ. কুরআনের আলোকে:**

মূল আয়াত **"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে।" (সুরা রা'দ, ১৩:২৮)**

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের অন্তরের প্রকৃত শান্তি কেবল তাঁর স্মরণেই নিহিত।

এখানে "যিকরুল্লাহ" বলতে বোঝানো হয়েছে—কুরআন তেলাওয়াত,নামাজ,দোয়া,আল্লাহর নাম উচ্চারণ,তাঁর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী চলা।

তাফসিরে ব্যাখ্যা (ইবন কাসির):**আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে অন্তর নরম হয়, দুঃখ দূর হয়, আশা জন্মায়, আর ঈমান দৃঢ় হয়।**

যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবন হয় অস্থির ও অশান্ত।

অন্য আয়াতগুলো

**"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য সংকীর্ণ জীবন নির্ধারিত হবে।" (সুরা ত্বাহা, ২০:১২৪)**

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে—যে আল্লাহকে ভুলে যায়, সে যতই সম্পদশালী হোক না কেন, তার

জীবন মানসিকভাবে সংকীর্ণ ও অশান্ত হয়ে পড়ে।

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন—

**"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব; আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ**

**হয়ো না।" (সুরা বাকারা, ২:১৫২)**

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, যে তাঁকে স্মরণ করবে, তিনি নিজে সেই বান্দাকে নিজের রহমত ও ভালোবাসায় স্মরণ করবেন—এটাই সুখের সর্বোচ্চ রূপ।

**গ. হাদীসের আলোকে:**

**১) জিকিরের মর্যাদা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে না—তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের মতো।"(সহিহ বুখারি)**

অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ মানুষকে জীবন্ত আত্মার অধিকারী করে তোলে, আর যে স্মরণ থেকে দূরে থাকে, সে আত্মিকভাবে মৃত।

**২) জিকিরে প্রশান্তি:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন—

**"যে ব্যক্তি বসে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ধরে, রহমত তাকে ঢেকে নেয়, এবং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে স্মরণ করেন।" (সহিহ মুসলিম)**

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, জিকির শুধু মনকে শান্ত করে না, বরং এটি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

**৩) নামাজে প্রশান্তি:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"আমার চোখের শীতলতা (অর্থাৎ প্রশান্তি) রেখেছেন নামাজে।" (সুনান নাসাঈ)**

নামাজ হচ্ছে জিকিরের সর্বোচ্চ রূপ। নামাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সামনে নিজেকে সমর্পণ করে, যা অন্তরে এমন প্রশান্তি দেয়—যা কোনো দুনিয়াবি জিনিসে পাওয়া যায় না।

**৪) জিকির ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক:**

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জিকির কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়; এটি মানসিক শান্তির একটি বাস্তব উপায়ও।আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে—ধ্যান, মনোযোগ ও কৃতজ্ঞতা মানসিক উদ্বেগ কমায়। ইসলামে জিকির এই তিনটিরই এক অনন্য সংমিশ্রণ।

যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পড়ে, নামাজ আদায় করে, এবং আল্লাহর নাম জপ করে, তার মধ্যে শান্তি, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচকতা জন্ম নেয়।

**৫) বাস্তব প্রয়োগ:**

- প্রতিদিন কিছু সময় আল্লাহর জিকিরে ব্যয় করা (যেমন—সকাল-সন্ধ্যার দোয়া, "সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার")।
- নামাজে মনোযোগ বাড়ানো।
- কুরআন তেলাওয়াত ও চিন্তাভাবনা করা।
- আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

এই নিয়মিত আমলগুলোই ধীরে ধীরে মন থেকে অস্থিরতা দূর করে স্থায়ী প্রশান্তি এনে দেয়।

### ৬) উপসংহার:

সারসংক্ষেপে বলা যায়—

**আল্লাহর স্মরণ (জিকির)** হলো সুখ ও শান্তির আসল উৎস।

**আল্লাহকে ভুলে যাওয়া** মানে মানসিক সংকীর্ণতা ও আত্মিক অস্থিরতা।

**জিকির, নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত** মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত, মনকে শক্তিশালী ও জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

অতএব, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায়—

**"প্রকৃত সুখ নিহিত আল্লাহর স্মরণে, আর আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় প্রশান্ত হৃদয়ই হলো সফল মানুষের প্রকৃত চিহ্ন।"**

৩.২ তাকওয়া ও সৎকর্ম

### ১) ভূমিকা:

মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি কেবল বাহ্যিক বস্তু বা আর্থিক সাফল্যে নয়, বরং আন্তরিক সততা, ঈমান  আল্লাহভীতিতে নিহিত।ইসলামের দৃষ্টিতে এই অভ্যন্তরীণ গুণগুলির মূলে আছে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং তার প্রকাশ ঘটে সৎকর্মের মাধ্যমে।তাকওয়া মানে শুধু পাপ থেকে বিরত থাকা নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন, যা মানুষকে আল্লাহভীতি, সততা, ধৈর্য, ও ন্যায়ের পথে রাখে — আর এই পথই প্রকৃত সুখের পথ।

### ২) কুরআনের আলোকে তাকওয়া ও সৎকর্ম:

**(ক) সূরা নাহল ১৬:৯৭ — সৎকর্মের বিনিময়ে সুখী জীবন**

**"যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার হয়ে সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাকে সুন্দর জীবন দান করব এবং পরকালে তাদের উত্তম প্রতিদান দেব।" (সূরা নাহল, ১৬:৯৭)**

◇ তাফসির ব্যাখ্যা:

এখানে "হায়াতান তায়্যিবাহ" (সুন্দর জীবন) বলতে বোঝানো হয়েছে প্রশান্ত, মর্যাদাপূর্ণ ও ঈমানপূর্ণ জীবন।এটি শুধুমাত্র বস্তুগত সুখ নয়, বরং অন্তরের শান্তি, আত্মিক তৃপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।আল্লাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলা মানুষ দুঃখের মাঝেও স্থির ও সুখী থাকে।

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—যে মানুষ ঈমান ও সৎকর্মে জীবন গড়ে, তাকে তিনি এই দুনিয়াতেই প্রশান্তি ও সুখ দান করেন, আর আখিরাতে দান করেন চিরন্তন পুরস্কার।

**(খ) সূরা তালাক ৬৫:২-৩ — তাকওয়াবানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য**

**“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন। এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।” (সূরা তালাক, ৬৫:২-৩)**

◇ তাফসির ব্যাখ্যা:

তাকওয়াবান ব্যক্তির জীবন কখনোই অন্ধকারে পড়ে না; আল্লাহ তার জন্য এমন পথ খুলে দেন যেটি সে আগে বুঝতেই পারেনি।তাকওয়া শুধু পরকালের সাফল্য দেয় না; বরং দুনিয়াতেও এনে দেয় সাহস, প্রশান্তি ও সহজতা। তাকওয়ার ফলস্বরূপ মানুষ ভয়, লোভ ও হতাশা থেকে মুক্ত থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহর ভয় ও বিশ্বাস মানুষকে এমন মানসিক স্থিতি দেয়, যা কোনো বিপদেও ভেঙে পড়ে না।

## ৩) হাদীসের আলোকে তাকওয়া ও সৎকর্ম

**(ক) তাকওয়ার মূল ব্যাখ্যা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“তাকওয়া এখানে”—এবং তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন। (সহিহ মুসলিম)**

অর্থাৎ, তাকওয়া হলো অন্তরের গুণ। বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং হৃদয়ের আল্লাহভীতি ও সততার প্রকাশ।

**(খ) তাকওয়ার গুরুত্ব**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না; তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।” (সহিহ মুসলিম)**

এই হাদীস শেখায়, আল্লাহর কাছে মর্যাদার মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া ও সৎকর্ম — বাহ্যিক অবস্থান নয়।

**(গ) তাকওয়ার ফলাফল**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য সব কিছুর মধ্যে থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দেন।” (ইবন মাজাহ)**

অর্থাৎ, তাকওয়াবান মানুষ কখনো হতাশ হয় না; আল্লাহর সাহায্য তার অজানার মধ্য থেকেও আসে।

## ৪) তাকওয়া ও সৎকর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক

তাকওয়া হলো মনের অবস্থা — আল্লাহভীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ।সৎকর্ম (আমলুস সালেহ) হলো সেই অভ্যন্তরীণ তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ।যেমন—

- তাকওয়াবান ব্যক্তি মিথ্যা বলে না, কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে।
- সে দান করে, কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়।
- সে অন্যের ক্ষতি করে না, কারণ সে জানে আল্লাহ সব দেখছেন।

তাই তাকওয়া ও সৎকর্ম একে অপরের পরিপূরক।

### ৫) তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে প্রকৃত সুখের কারণ

তাকওয়া ও সৎকর্ম মানুষের জীবনে এমন এক মানসিক ও আত্মিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে যা প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি।

প্রথমত, আল্লাহভীতি (তাকওয়া) মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে। যখন একজন মানুষ পাপ থেকে দূরে থাকে, তার মন ও বিবেক শান্ত থাকে; অপরাধবোধ, ভয় বা অনুতাপ তার অন্তরে বাসা বাঁধতে পারে না। এই অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা থেকেই জন্ম নেয় প্রকৃত সুখ।

দ্বিতীয়ত, সৎকর্ম মানুষকে সমাজে সম্মানিত করে এবং তার চারপাশে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে। যখন কেউ সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সাহায্যপ্রবণ ও দয়ালু হয় — তখন সে নিজেও আনন্দ পায় এবং সমাজও তাকে ভালোবাসে। এই পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান সুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

তৃতীয়ত, বিশ্বাস (ঈমান) তাকওয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে, জীবনের বিপদ বা অনিশ্চয়তার সময় তাকে স্থির থাকতে সাহায্য করে। ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে প্রতিটি ঘটনার পেছনে আল্লাহর হিকমত (জ্ঞান ও উদ্দেশ্য) আছে, তাই সে হতাশ হয় না।

চতুর্থত, তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন, যেমন কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন" (সূরা তালাক ৬৫:২-৩)। এই সাহায্যের অনুভূতি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও নিরাপদ রাখে। সে জানে, সে একা নয়—তার পাশে আছেন পরম করুণাময় আল্লাহ।

শেষত, আখিরাতের প্রতি আশা তাকওয়াবান ব্যক্তিকে দুনিয়ার কষ্টে ধৈর্যশীল ও শান্ত রাখে। সে জানে, এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, আর প্রকৃত পুরস্কার ও আনন্দ পরকালে অপেক্ষা করছে। তাই জীবনের অস্থিরতা ও দুঃখও তাকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিতে পারে না।

অতএব, তাকওয়া ও সৎকর্ম মানুষকে যে অন্তরের প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দেয়—সেই অবস্থাই প্রকৃত সুখ।

**৬) বাস্তব প্রয়োগ**

- দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট সৎকর্ম করা (যেমন—মুচকি হাসা, কারো উপকার করা, নামাজ আদায় করা)।
- প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে ভাবা—"আল্লাহ এটা পছন্দ করবেন কি?"
- পাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা, যদিও কেউ না দেখে।
- দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা।
- আল্লাহর বিধানের উপর ভরসা রাখা, উদ্বেগ নয় বরং আস্থা রাখা

**৭) উপসংহার**

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, তাকওয়া হলো সুখের মূলভিত্তি, আর সৎকর্ম হলো সেই সুখের প্রকাশ। যে ব্যক্তি আল্লাহভীতির সঙ্গে সৎ জীবন যাপন করে, আল্লাহ তাকে এমন "সুন্দর জীবন" দান করেন—যেখানে ভয়, হতাশা ও উদ্বেগের জায়গায় থাকে প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর ওপর আস্থা। **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াবানদের ভালোবাসেন।" (সূরা তাওবা, ৯:৪)**

৩.৩ : ধৈর্য্য (সবর) ও কৃতজ্ঞতা (শুকর): প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি

**১ )ভূমিকা:**

ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে সুখ কেবল ভৌত আরাম বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপর নির্ভর করে না, বরং আত্মিক শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। এ সুখ লাভের দুইটি মৌলিক নীতি হলো— সবর (ধৈর্য্য ) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা)। জীবনের সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, আনন্দ-বেদনার প্রতিটি অবস্থায় এই দুই গুণ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিচায়ক।

**২) ধৈর্য্যের সংজ্ঞা ও ধরন:**

ধৈর্য্য কেবল দুঃখ সহ্য করা নয়, বরং আল্লাহর বিধান মেনে চলার দৃঢ়তা।ইসলামী পরিভাষায় ধৈর্য্য তিন প্রকার: ১.ইবাদতে ধৈর্য্য,

২.পাপ থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য্য,

৩.বিপদে ধৈর্য্য।

**৩) বিপদে ধৈর্য্যের প্রতিদান:**

আল্লাহ বলেন,

**"নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দিব সীমাহীনভাবে।" (সূরা আজ-যুমার ৩৯:১০)**

নবী ﷺ বলেছেন:

**"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে আরও ধৈর্য দান করেন।" (সহিহ বুখারী ১৪৬৯)**

**৪) কৃতজ্ঞতার ধরন ও প্রকাশ:**

মুখে, মনে ও কর্মে কৃতজ্ঞতা — এই তিনটি স্তরে শুকর প্রকাশ পায়।

- মুখে: "আলহামদুলিল্লাহ" বলা,
- মনে: নিয়ামতের উৎস আল্লাহ তা স্বীকার করা,
- কর্মে: আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

**৫) ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্ক:**

সুখে কৃতজ্ঞতা যেমন অপরিহার্য, দুঃখে ধৈর্য তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

নবী ﷺ বলেছেন:

**"মুমিনের প্রতিটি অবস্থা কল্যাণকর — সুখে শুকর, দুঃখে সাবর।" (সহিহ মুসলিম ২৯৯৯)**

**৬) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে মানসিক শান্তি:**

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্রমাণিত — যেসব মানুষ জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ, তাদের মানসিক চাপ কম থাকে।ইসলামী দৃষ্টিতে, এই প্রশান্তিই প্রকৃত সুখ।

আল্লাহ বলেন:

**"যে কৃতজ্ঞ হয়, সে নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়।" (সূরা লুকমান ৩১:১২)**

**৭) ধৈর্য (সবর): কুরআনের আলোকে:**

কুরআনে 'সবর' শব্দটি প্রায় ৭০টিরও বেশি স্থানে এসেছে। এটি শুধুমাত্র দুঃখে সহ্য করা নয়, বরং আল্লাহর বিধান মেনে চলা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে অবিচল থাকার প্রতীক।

আল্লাহ বলেন—

**"আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।"— (সূরা আল-বাকারা 2:155)**

এই আয়াত মানবজীবনের পরীক্ষা ও সংগ্রামের স্বাভাবিকতাকে নির্দেশ করে। এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, বিপদে যারা ধৈর্য ধরে, তারাই প্রকৃত সফল। কারণ ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষ নিজের আত্মাকে প্রশিক্ষিত করে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখে।

আরও বলা হয়েছে—

**“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আছেন।” — (সূরা আল-বাকারা 2:153)**

এখানে “আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন” — এই ঘোষণা মানুষকে আত্মিক নিরাপত্তা ও অন্তরের প্রশান্তি দেয়, যা প্রকৃত সুখের একটি প্রধান উৎস।

**৮) হাদীসের আলোকে ধৈর্য্য:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“মুমিনের সব অবস্থাই কল্যাণকর। যদি তাকে সুখ দেওয়া হয়, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর যদি বিপদ আসে, সে ধৈর্য ধারণ করে — এটাই তার জন্য কল্যাণকর।”— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯৯৯)**

এই হাদীসটি ‘সবর ও শুকর’-এর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এতে বোঝানো হয়েছে, সুখ ও দুঃখ—উভয় অবস্থায়ই মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে থাকে। তাই ধৈর্য কোনো নেতিবাচক স্থিতি নয়, বরং আত্মিক শক্তির প্রকাশ।

**৯) কৃতজ্ঞতা (শুকর): কুরআনের আলোকে:**

‘শুকর’ অর্থ হচ্ছে অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কুরআনে বলা হয়েছে—

**“যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও অধিক অনুগ্রহ প্রদান করব।”— (সূরা ইবরাহীম 14:7)**

এ আয়াতে আল্লাহ সুখ ও আশীর্বাদের রহস্য প্রকাশ করেছেন: কৃতজ্ঞ হৃদয় নতুন বরকত আহ্বান করে। অর্থাৎ, সুখের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের চাবিকাঠি হলো শুকর।আরও বলা হয়েছে—

**“অল্পসংখ্যক বান্দাই কৃতজ্ঞ।”— (সূরা সাবা 34:13)**

এখানে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, কৃতজ্ঞতা সহজ নয়; এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, যা অন্তরের অহংকার দূর করে আল্লাহর মহিমা অনুভব করতে শেখায়।

**১০). হাদীসের আলোকে কৃতজ্ঞতা:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“যে মানুষকে ধন্যবাদ দেয় না, সে আল্লাহকেও ধন্যবাদ দেয় না।”— (তিরমিজি, হাদীস: ১৯৫৪)**

এই হাদীস আমাদের শেখায় যে, শুকর শুধু মুখের কথা নয়; এটি আচরণ, আন্তরিকতা এবং অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

**“যে নিজের জীবিকা ও অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে প্রকৃত ধনী।”— (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৪৬)**

এখানে প্রকৃত সুখের উৎস হিসেবে আত্মতুষ্টি ও আল্লাহর কদরের প্রতি বিশ্বাসকে নির্দেশ করা হয়েছে।

**১১) 'সবর' ও 'শুকর'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক:**

ইসলামী দৃষ্টিতে, জীবন একদিকে পরীক্ষার ক্ষেত্র, অন্যদিকে অনুগ্রহের ধারক। তাই:বিপদে সবর মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে,আর আশীর্বাদে শুকর ঈমানকে স্থায়ী রাখে।উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হলো "প্রকৃত সুখী মুমিনের পরিচয়"। ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

**"মুমিনের জীবন দুই ডানায় উড়ে — এক ডানায় ধৈর্য, অন্য ডানায় কৃতজ্ঞতা।"— (মাদারিজ আস-সালিকীন, খণ্ড ২)**

❖ **ধৈর্য (সবর) এর গুরুত্ব ও ফলাফল**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু স্থানে ধৈর্যধারণের প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন—

**"আর তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"(সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬)**

এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তাঁর সান্নিধ্য দান করেন ধৈর্যশীলদেরকে। এ সান্নিধ্যই প্রকৃত সুখের উৎস, কারণ আল্লাহর সঙ্গে থাকা মানেই মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

**"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, প্রাণ ও ফলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৫৫)**

ইবন কাসির তাফসিরে বলেন—**"মানুষের জীবনে বিপদাপদ হলো আল্লাহর পরীক্ষা। যারা এসব বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের জন্য এমন শান্তি ও পুরস্কার রাখেন যা দুনিয়ার সব সুখকে ছাপিয়ে যায়।"**

প্রকৃতপক্ষে, ধৈর্য এমন এক গুণ যা বিপদের সময় মনকে স্থির রাখে, হতাশা থেকে দূরে রাখে এবং মানুষের মধ্যে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

**"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান অসংখ্য পরিমাণে প্রদান করা হবে।"(সূরা আজ-যুমার ৩৯:১০)**

প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন—

**“মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক! তার প্রত্যেক অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। সুখ পেলে কৃতজ্ঞ হয়—তাতেও কল্যাণ আছে; দুঃখ পেলে ধৈর্য ধরে—তাতেও কল্যাণ আছে।”(সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯)**

এই হাদীসটি ইসলামে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়।

❖ **কৃতজ্ঞতা (শুকর) এর মাহাত্ম্য**

কৃতজ্ঞতা হচ্ছে সুখের আরেকটি প্রধান স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

**“যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দিব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠিন।” (সূরা ইব্রাহীম ১৪:৭)**

এই আয়াত জানিয়ে দেয় যে, কৃতজ্ঞতা শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়—বরং এটি আল্লাহর রহমত বাড়ানোর মাধ্যম। যখন মানুষ আল্লাহর দান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং অকৃতজ্ঞ হয় না, তখন তার অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি জন্ম নেয়।

তাফসির কুরতুবীতে বলা হয়েছে—**“কৃতজ্ঞতা মানে শুধু মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেই নিয়ামতকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করা।”**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।”(আবু দাউদ, হাদীস ৪৮১১)**

অতএব, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর প্রতিই নয়, বরং মানুষের প্রতিও একটি নৈতিক দায়িত্ব। এই কৃতজ্ঞতার অভ্যাস মানুষকে আত্মতুষ্টি ও সন্তুষ্ট জীবনযাপনে সহায়তা করে।

❖ **ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সমন্বয়: প্রকৃত সুখের গোপন রহস্য**

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা একে অপরের পরিপূরক। ধৈর্য ছাড়া মানুষ বিপদের সময় স্থির থাকতে পারে না, আর কৃতজ্ঞতা ছাড়া সুখের সময় অহংকারে পড়ে যায়।যখন একজন ব্যক্তি দুঃখে ধৈর্যশীল ও সুখে কৃতজ্ঞ থাকে, তখন সে জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম গাজ্জালী বলেন—

**“যে ব্যক্তি ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে, সে প্রকৃত জ্ঞানের স্বাদ পেয়েছে; কারণ এই দুটোই অন্তরের শান্তি ও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম।”**

অতএব, প্রকৃত সুখ কোনো বাহ্যিক অবস্থায় নয়, বরং মানুষের অন্তরের এই দুই গুণ—সবর ও শুকর—এর সুষম চর্চায় নিহিত। যে ব্যক্তি এই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তার জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মিক প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

**১২) উপসংহার:**

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এমন দুই আধ্যাত্মিক গুণ যা মানুষের হৃদয়কে স্থির রাখে, মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং জীবনের প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পরিচালিত করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বলা যায়—

**"সবর ও শুকরই প্রকৃত সুখের দুই স্তম্ভ।"**

যার অন্তরে এই দুই গুণ প্রতিষ্ঠিত, সে দুঃখেও শান্ত, কষ্টেও তৃপ্ত, এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়।

৩.৪: ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি (সালাত, যাকাত, রোজা, হজ)

**১)ভূমিকা:**

ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি মানুষের আত্মা ও হৃদয়ে নিহিত, যা অর্জিত হয় কেবল আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, পদমর্যাদা বা সম্পদ হয়তো সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী প্রশান্তি দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।"— (সূরা আয-যারিয়াত 51:56)**

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত করা, যা তাকে আত্মিক পূর্ণতা ও অন্তরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়। ইবাদত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম, আর সমাজে ন্যায় ও সহমর্মিতার বন্ধন দৃঢ় করে।

**২) সালাত (নামাজ): আত্মার প্রশান্তির উৎস:**

সালাত ইসলামের সবচেয়ে মৌলিক ও ধারাবাহিক ইবাদত। এটি মুমিনকে দিনে পাঁচবার আল্লাহর স্মরণে স্থিত রাখে। সালাতের মাধ্যমে মানুষ নিজের অহংকার ত্যাগ করে, আল্লাহর সামনে বিনম্র হয়, যা আত্মাকে বিনয়ী ও শান্ত রাখে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে, এবং আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম।"— (সূরা আল-আনকাবূত 29:45)**

এই আয়াত প্রমাণ করে, নামাজ শুধু ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি নৈতিক প্রশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি ও মানসিক স্থিরতার চাবিকাঠি। নামাজ মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী ও ধৈর্যশীল হতে শেখায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**"হে বিলাল, আমাদের জন্য নামাজের আহ্বান দাও; যেন আমরা এতে প্রশান্তি লাভ করি।"— (সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯৮৫)**

এই বাণী দেখায় যে, নামাজ নবী ﷺ এর কাছে কেবল দায়িত্ব নয়, বরং হৃদয়ের প্রশান্তির উৎস ছিল।মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সালাত এক ধরনের ধ্যানমূলক অবস্থা (Meditative State)—যেখানে মন শান্ত হয়, স্ট্রেস কমে, এবং আত্মিক স্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

**৩) যাকাত: সামাজিক ন্যায় ও হৃদয়ের স্বচ্ছতা:**

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থই হলো "পরিশুদ্ধি ও বৃদ্ধি"। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত একটি সামাজিক ভারসাম্যের ব্যবস্থা, যা ধনীদের সম্পদ পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

আল্লাহ বলেন —

**"তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর; এর মাধ্যমে তুমি তাদের পরিশুদ্ধ করবে ও পবিত্র করবে।"— (সূরা আত-তাওবা 9:103)**

এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, যাকাত আত্মাকে লোভ, কৃপণতা ও গর্ব থেকে মুক্ত করে। ধনীরা দান করার মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করে—কারণ এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন — **"দান সম্পদ কমায় না; বরং আল্লাহ তা বৃদ্ধি করেন।" — (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৮)**

অর্থাৎ, প্রকৃত সুখ তখনই আসে যখন মানুষ নিজের প্রাপ্তিতে অন্যের অংশ বুঝতে শেখে। যাকাত সমাজে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে, যা সামাজিক শান্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রশান্তি এনে দেয়।

**৪) রোজা (সিয়াম): আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধি:**

রোজা এমন একটি ইবাদত, যা শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত প্রশিক্ষণ দেয়। এটি মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

আল্লাহ বলেন —

**"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করা হয়েছিল, যেন তোমরা পরহেজগার হও।"— (সূরা আল-বাকারা 2:183)**

রোযার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা–তৃষ্ণা সহ্য করা নয়; বরং আত্মাকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা নেওয়া। ক্ষুধার্ত অবস্থায় মানুষ অন্যের কষ্ট অনুভব করে, ফলে দয়ার, ধৈর্যের ও সহানুভূতির গুণ অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**"যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।"— (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৯০১)**

রোযা আত্মাকে শুদ্ধ করে, মনোসংযম বৃদ্ধি করে, এবং মানসিক শক্তি জাগ্রত করে। আধুনিক গবেষণাও দেখায়, রোযা মানসিক স্থিতি ও স্নায়বিক প্রশান্তি বাড়ায়, যা সুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

**৫) হজ: আত্মসমর্পণ ও ঐক্যের প্রতীক:**

হজ হলো ইবাদতের পরিপূর্ণ প্রতীক, যেখানে একত্রিত হয় আত্মসমর্পণ, ত্যাগ, ঐক্য ও আখিরাতের চিন্তা।আল্লাহ তাআলা বলেন —

**"এবং মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের (বাইতুল্লাহর) হজ পালন করা ফরজ, যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।" — (সূরা আলে ইমরান 3:97)**

হজ মানুষকে শেখায়—মানুষের প্রকৃত পরিচয় হলো "আবদুল্লাহ" (আল্লাহর দাস)। এখানে রাজা-ভিখারি সবাই এক পোশাকে, এক উদ্দেশ্যে, এক দিকমুখী হয়ে দাঁড়ায়—এটাই ইসলামী সমতার চিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**"যে ব্যক্তি হজ আদায় করে, অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত থাকে, সে এমন অবস্থায় ফিরে আসে যেন সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে।" — (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪৪৯)**

অর্থাৎ, হজ মানুষের আত্মাকে নবজীবন দেয়। এটি তাকে বিনয়, ত্যাগ ও আখিরাতের চিন্তায় প্রণোদিত করে। মক্কার আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে মানুষ উপলব্ধি করে—জীবনের সব মর্যাদা, সম্পদ, ও কৃতিত্ব আসলে ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত প্রশান্তি নিহিত আল্লাহর ক্ষমায় ও নৈকট্যে।

**৬) ইবাদতের সামগ্রিক প্রভাব:**

ইবাদত কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ও বৈশ্বিক শান্তিরও মূলভিত্তি। সালাত মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়, যাকাত সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, রোযা আত্মাকে শুদ্ধ করে, আর হজ মানব ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এভাবে ইবাদতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এক শান্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ—যেখানে মানুষের অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং জীবনে আসে প্রকৃত সুখ।

**৭) উপসংহার :**

- সালাত আত্মাকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং দেয় মনোযোগ ও ধ্যানের প্রশান্তি।
- যাকাত সমাজে ন্যায় ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা করে।
- রোজা দেয় আত্মসংযম ও তাকওয়ার শক্তি।
- হজ দেয় আত্মসমর্পণ ও আখিরাতের চিন্তা।

ইবাদত ইসলামের হৃদয়।এভাবে চারটি ইবাদত মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক সাম্য—যা ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত সুখের পরিপূর্ণ রূপ। অতএব, ইবাদতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণে স্থিত হয়, তার হৃদয় শান্ত হয়, এবং সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে প্রকৃত সুখ অর্জন করে।

৩.৫. ন্যায়বিচার ও সততা — প্রকৃত সুখের সামাজিক ও আত্মিক ভিত্তি

## ১. ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সুখ ও শান্তি সর্বদা মানুষের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু প্রকৃত সুখ কেবল ধনসম্পদ, ক্ষমতা বা ভোগ-বিলাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম এই সুখকে সংজ্ঞায়িত করেছে এমন এক অবস্থান হিসেবে, যেখানে মানুষ আত্মিক প্রশান্তি, সামাজিক সাম্য, ও নৈতিক ভারসাম্যের মধ্যে জীবনযাপন করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ন্যায়বিচার ('আদল) ও সততা (সিদক/আমানত) হলো সেই ভিত্তি, যার উপর সমাজে প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি টিকে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, উত্তম আচরণ ও আত্মীয়কে দান করার আদেশ দেন; এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন।" (সূরা আন-নাহল 16:90)**

এই আয়াতটি ইসলামী সমাজব্যবস্থার নৈতিক কাঠামো তুলে ধরে, যেখানে ন্যায় ও সততা কেবল সামাজিক নীতি নয়, বরং তা ইমানের প্রকাশ।

## ২. ন্যায়বিচারের (আদল) ইসলামী দর্শন ও গুরুত্ব:

ন্যায়বিচার ইসলাম ধর্মে এমন এক মৌলিক মূল্যবোধ, যা মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রযোজ্য — ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রশাসনিক, ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত।ইসলামে

ন্যায়বিচার মানে হলো "প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া এবং কোনো অবস্থাতেই পক্ষপাতিত্ব না করা।" আল্লাহ তাআলা বলেন —

**"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।"(সূরা আন-নিসা 4:135)**

এখানে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে ন্যায়বিচার শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং এটি আল্লাহর হুকুম পালনের একটি ইবাদত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**"ন্যায়পরায়ণ শাসকরা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮২৭)**এর দ্বারা বোঝা যায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা কেবল সামাজিক দায় নয়, বরং তা আখিরাতের মুক্তিরও মাধ্যম।

**৩. ন্যায়বিচার ও সমাজে সুখের সম্পর্ক:**

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত সমাজে মানুষ সমান নিরাপত্তা ও মর্যাদা অনুভব করে। এমন সমাজে কেউ. নিপীড়িত হয় না, কারও অধিকার হরণ হয় না, এবং শাসক থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই আইনের আওতায় থাকে।

মনোবিজ্ঞান বলছে, নিরাপত্তা অনুভব (sense of security) মানুষের মানসিক প্রশান্তির প্রথম শর্ত। অন্যায় যখন সমাজে স্থান পায়, তখন অবিশ্বাস, হিংসা, ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়—যা মানসিক অস্থিরতা ও অসুখের মূল।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ন্যায়বিচারের বাস্তব উদাহরণ হলো, যখন তিনি বলেছিলেন:

**"যদি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে একটি গাধাও হোঁচট খায়, আমি আশঙ্কা করি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কেন রাস্তা সমান করনি।"**

এই বক্তব্য শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ন্যায়ের প্রতি এক গভীর আত্মিক সচেতনতা প্রকাশ করে। এমন ন্যায়বোধই সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

**৪. সততা (সিদক ও আমানত) — ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক শক্তি:**

সততা হলো সত্য, ন্যায়, ও দায়িত্ববোধের সমন্বিত রূপ।

কুরআনে বলা হয়েছে —

**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত (দায়িত্ব) তাদের হাতে অর্পণ করতে যারা এর যোগ্য, এবং যখন তোমরা বিচার করো, ন্যায়বিচার কর।" (সূরা আন-নিসা 4:58)**

অর্থাৎ, সততা ও ন্যায়বিচার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত — সততা ছাড়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“সততা মানুষকে ন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর ন্যায় মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)**

যখন একজন মানুষ সৎ থাকে, তার মধ্যে আত্মিক শান্তি, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়। মিথ্যা বা প্রতারণা করলে সাময়িক লাভ হতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে অস্থিরতা ও অপরাধবোধ জন্মায় — যা সুখের বিপরীত।

**৫. ন্যায় ও সততার অভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্থিরতা:**

অন্যায় ও অসততা সমাজে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তা কেবল অর্থনৈতিক নয় — বরং নৈতিক ও মানসিকও।যেখানে দুর্নীতি, প্রতারণা, ও ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পায়, সেখানে সামাজিক আস্থা নষ্ট হয়, শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয়, এবং মানুষ পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, অসততা ও অন্যায় মানুষের মধ্যে guilt feeling, anxiety এবং fear তৈরি করে। এর ফলেই ব্যক্তি সুখ হারায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন —**“যে ব্যক্তি অন্যায় করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে।” (সূরা ইউনুস 10:44)** এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, অন্যায়ের ফল কেবল বাহ্যিক নয় — বরং তা মানুষের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

**৬. ন্যায়বিচার ও সততা — ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের ভিত্তি:**

ইসলাম স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয়, ন্যায় ও সততা আল্লাহর নিকট প্রিয়তম কাজ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**“যে ব্যক্তি মানুষকে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০২)**

এটি প্রমাণ করে যে সততা কেবল একটি সামাজিক নীতি নয়, বরং এটি ঈমানের শর্ত।ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে সম্মানিত হন এবং পরকালে আল্লাহর ছায়ায় আশ্রিত থাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন —

**“যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি ও উত্তম পরিণাম।” (সূরা রা’দ 13:29)**

**৭. ন্যায় ও সততার মাধ্যমে প্রকৃত সুখের আত্মিক ব্যাখ্যা:**

ইসলামী আত্মিক দর্শনে (spiritual psychology) বলা হয়, সত্য ও ন্যায়ের জীবনযাপন করলে হৃদয়ে ইত্তমিনান (اطْمِئْنَان) অর্থাৎ “আত্মার প্রশান্তি” জন্মায়।ন্যায় ও

সততার জীবনই মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে রাখে, ফলে তার আত্মা স্থির থাকে এবং সমাজে সে অন্যদের জন্য নিরাপত্তা ও সুখের উৎসে পরিণত হয়।

**৮. উপসংহার:**

ন্যায়বিচার ও সততা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রকৃত সুখের মৌলিক ভিত্তি।ন্যায় প্রতিষ্ঠা সমাজে সমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, আর সততা ব্যক্তির আত্মায় প্রশান্তি এনে দেয়।

এই দুই গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এমন এক সমাজ, যেখানে মানুষ পারস্পরিক আস্থা, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে।ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, ন্যায় ও সততার পথই প্রকৃত সুখ ও মুক্তির পথ।

৩.৬ আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি — প্রকৃত সুখের চূড়ান্ত ভিত্তি

## ১. ভূমিকা

মানুষের সুখের অনুসন্ধান কেবল এই পৃথিবীর সীমিত জীবনের জন্য নয়; বরং ইসলাম শেখায় যে প্রকৃত সুখ নিহিত আছে আখিরাতে (পরকালীন জীবনে) ।দুনিয়ার জীবন কেবল এক অস্থায়ী পরীক্ষা, আর আখিরাত হলো এর ফলাফলের চূড়ান্ত প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

**“যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার জীবন কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দেই; কিন্তু আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই।” (সূরা আশ-শূরা 42:20)**

অতএব, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, সম্পদ ও খ্যাতির পেছনে ছুটে চলে, সে কখনো স্থায়ী সুখ পায় না। প্রকৃত সুখের জন্য প্রয়োজন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা আখিরাতের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে গঠিত।

## ২. আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামের মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি

ইসলামে জীবনের দর্শন হলো — “দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতিটি কাজই আখিরাতের ফল নির্ধারণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।” (সুনান আত-তিরমিজি, হাদীস: ২৪৫৯)**

এই হাদীসটি মানুষের সুখের মূল দর্শন প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি আখিরাতের হিসাবকে সামনে রেখে জীবনযাপন করে, সে দুনিয়ার সাময়িক কষ্টেও প্রশান্ত থাকে, কারণ সে জানে প্রকৃত পুরস্কার পরকালে অপেক্ষা করছে।

### ৩. দুনিয়াবিমুখতা নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদৃষ্টি

ইসলাম মানুষকে দুনিয়াবিমুখ হতে বলে না; বরং বলে দুনিয়াকে আখিরাতের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে।আল্লাহ তাআলা বলেন —

**"তুমি আল্লাহর দেয়া দান দ্বারা আখিরাতের ঘর অনুসন্ধান কর; তবে দুনিয়ার অংশও বিস্মৃত হয়ো না।"(সূরা আল-কাসাস 28:77)**

অর্থাৎ, প্রকৃত সুখ তখনই আসে যখন মানুষ দুনিয়ার কাজকে আখিরাতের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে।যেমন— রিজিক উপার্জন, পরিবার লালন, বা সমাজসেবা— যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তবে তা ইবাদত এবং আখিরাতের সুখের উপকরণে পরিণত হয়।এই ভারসাম্যই মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়, কারণ সে জানে— তার প্রতিটি সৎকর্ম আল্লাহর নিকটে নষ্ট হবে না।

### ৪. আখিরাতচেতনা ও অন্তরের প্রশান্তি

আখিরাতমুখী মানুষ জানে, এই পৃথিবীতে অন্যায়, কষ্ট বা বঞ্চনা চিরস্থায়ী নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—**"তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আনফাল 8:46)**

এই বিশ্বাস মানুষকে কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ় রাখে।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যাদের মধ্যে আখিরাতচেতনা দৃঢ়, তারা হতাশায় ভোগে না; কারণ তারা জীবনের প্রতিটি দুঃখে এক উচ্চতর উদ্দেশ্য দেখে।তারা বিশ্বাস করে— ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ রূপ পরকালে বাস্তবায়িত হবে, এবং আল্লাহ প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিদান দেবেন।

### ৫. দুনিয়ার সুখ বনাম আখিরাতের সুখ: কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ

ইসলামী দর্শনে দুনিয়া ও আখিরাত—এই দুটি জগতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আল্লাহ তাআলা মানুষকে উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করতে শিখিয়েছেন, তবে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

**"এই পার্থিব জীবন তো কেবল খেল ও আমোদ-প্রমোদ; কিন্তু আখিরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো।" (সূরা আল-আনকাবুত 29:64)**

এই আয়াতটি দুনিয়ার সুখের অস্থায়িত্ব ও আখিরাতের সুখের স্থায়িত্বের তুলনা স্পষ্ট করে। দুনিয়ার সুখ সাধারণত বস্তুগত— যেমন সম্পদ, পদমর্যাদা, খ্যাতি, বা ভোগবিলাস। এই আনন্দগুলো মানুষকে সাময়িক তৃপ্তি দেয়, কিন্তু চিরস্থায়ী প্রশান্তি দেয় না। কারণ এগুলো ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু বা বিপর্যয়ের সাথে হারিয়ে যায়।অন্যদিকে, আখিরাতের সুখ হলো এমন এক চিরস্থায়ী প্রশান্তি যা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

**“যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার জীবন কামনা করে, আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দেই; কিন্তু আখিরাতে তার কোনো অংশ নেই।” (সূরা আশ-শূরা 42:20)**

অর্থাৎ, যে মানুষ কেবল দুনিয়ার আনন্দেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ সে আখিরাতের অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হবে।অন্যদিকে, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের প্রস্তুতি হিসেবে দেখে, তারা উভয় দুনিয়াতেই শান্তি লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— **“দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।”**

অর্থাৎ, এই দুনিয়ায় মানুষ যা বপন করবে, আখিরাতে তাই ফল পাবে।

সুতরাং, দুনিয়ার সুখ ও আখিরাতের সুখের পার্থক্য শুধু সময়ের নয়, মানেরও। দুনিয়ার সুখ ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, কিন্তু আখিরাতের সুখ স্থায়ী, পরিপূর্ণ এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণ প্রশান্ত করে।একজন আখিরাতমুখী মানুষ জানে যে তার জীবনের আসল সফলতা এই দুনিয়ায় নয়, বরং আল্লাহর সান্নিধ্যে। এই উপলব্ধিই তাকে দুনিয়ার বিপদেও ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ রাখে, যা প্রকৃত সুখের পরিচায়ক।

**৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের জীবনে আখিরাতচেতনা**

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আখিরাতের চেতনা (পরকাল-সচেতনতা) হলো মানবজীবনের মূল প্রেরণা। দুনিয়ার জীবনে নৈতিকতা, ধৈর্য, ন্যায়বিচার ও ত্যাগের যে অনুপ্রেরণা মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে এই আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। কুরআন বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত জীবন আখিরাতের জীবন, আর দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষা ক্ষেত্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**“আর দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদের ছাড়া আর কিছু নয়; আর নিশ্চয়ই পরকালই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।” (সূরা আনকাবুত, 29:64)**

এই আয়াত মানুষকে শেখায় যে, দুনিয়ার সুখ-ভোগ ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত সুখ, শান্তি ও সাফল্য নিহিত আছে আখিরাতে — যেখানে সৎকর্মের পুরস্কার ও আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ জীবনে আখিরাতচেতনাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি দুনিয়ার প্রতি কখনো আকৃষ্ট হননি, বরং দুনিয়াকে দেখেছেন এক ক্ষণস্থায়ী যাত্রাপথ হিসেবে।তিনি বলেন —

**“আমি এই দুনিয়ায় সেই পথিকের মতো, যে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: 6416)**

এই হাদীসের মাধ্যমে নবী ﷺ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে দুনিয়া হলো এক ক্ষণস্থায়ী বিশ্রামের স্থান — প্রকৃত গন্তব্য আখিরাত। এই উপলব্ধিই মানুষকে অতি ভোগবাদ থেকে দূরে রাখে, বিনয়ী করে তোলে এবং জীবনের লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ার সামান্য জিনিসেও সন্তুষ্ট থাকতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **"নবী করিম ﷺ কখনো টানা তিন দিন পেট ভরে খাবার খাননি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: 6459)**তাঁর দৃষ্টি ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে, না যে বিলাসিতার দিকে।তাঁর সাহাবারাও এই চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন — **"যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, তার দুনিয়ার কষ্টও মধুর মনে হয়।"**

হযরত উমর (রা.) রাতের বেলা কেঁদে বলতেন, **"হিসাবের দিনটি দীর্ঘ হবে; তাই আমি আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি।"** এই ছিল তাদের জীবনদর্শন — দুনিয়ার কাজকে আখিরাতের প্রস্তুতি হিসেবে দেখা।

আখিরাতচেতনাই তাদের নৈতিক শক্তির উৎস ছিল। তারা দুনিয়ায় ন্যায়বিচার, দান-খয়রাত, ইবাদত ও ত্যাগের মাধ্যমে সেই পরকালের সফলতার জন্য প্রস্তুতি নিতেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**"যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা করে, আর সে মুমিন হয় — তবে তার চেষ্টা আল্লাহর কাছে স্বীকৃত হবে।" (সূরা ইসরা, 17:19)**

এই আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল এক বিশ্বাস নয় — এটি মানুষকে সক্রিয়, ন্যায়পরায়ণ ও আত্মশুদ্ধ জীবনের পথে পরিচালিত করে।

অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবারা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে দেখলেও, তাদের অন্তর সবসময় আখিরাতের প্রতি আকর্ষিত ছিল। এই বিশ্বাসই তাদের জীবনে এনে দিয়েছিল অটল শান্তি, সাহস ও আত্মতৃপ্তি।তারা জানতেন — প্রকৃত সুখ ও শান্তি দুনিয়ার সাফল্যে নয়, বরং আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভে।

### ৭. আখিরাতচেতনা ও নৈতিক উন্নতি

যখন একজন মানুষ জানে, তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে।এই আত্মনিয়ন্ত্রণই সমাজে প্রকৃত শান্তি আনে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

**"যে ব্যক্তি আখিরাতকে উদ্দেশ্য বানায়, আল্লাহ তার অন্তরকে সমৃদ্ধ করেন এবং দুনিয়া তার কাছে নিজেই আসে।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪১০৫)**

অর্থাৎ, আখিরাতমুখী ব্যক্তি শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়াতেও প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে।

**৮. আখিরাতের সুখের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিদান**

কুরআনে আখিরাতের সুখকে জান্নাতের প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও আল্লাহর সান্নিধ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে—

**"তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ 98:8)**

এই আয়াত প্রমাণ করে, প্রকৃত সুখ কেবল তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়।

**৯. উপসংহার**

আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জীবনে স্থায়ী শান্তি ও উদ্দেশ্য এনে দেয়।দুনিয়ার সুখ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাতের সুখ অনন্ত।যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করে, সে মানসিকভাবে স্থির, আত্মিকভাবে প্রশান্ত ও নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ থাকে।

অতএব, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়— **"আখিরাতচেতনা ছাড়া প্রকৃত সুখ সম্ভব নয়।"**

কারণ, দুনিয়ার সকল সাফল্যের পরিণতিও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নির্ভরশীল।

## অধ্যায় ৪: হাদীসের আলোকে প্রকৃত সুখ

### ৪.১ অন্তরের সমৃদ্ধিই প্রকৃত সম্পদ

ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে যে, প্রকৃত সুখ কোনো বস্তুগত প্রাচুর্য বা আর্থিক সমৃদ্ধির মধ্যে নয়; বরং তা নিহিত আছে মানুষের অন্তরের শান্তি ও আত্মতৃপ্তিতে।ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা খ্যাতি কোনো মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তি নিশ্চিত করতে পারে না, যদি না তার আত্মা সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে। এই সত্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের মাধ্যমে ও হাদীসের বাণীতে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

**"ধনসম্পদের প্রাচুর্য নয়, বরং অন্তরের সমৃদ্ধিই প্রকৃত সম্পদ।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: 6446; সহীহ মুসলিম, হাদীস: 1051)**

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, এখানে "غِنَى النَّفْس" (গিনান-নাফস) বা "অন্তরের সমৃদ্ধি" বলতে বোঝানো হয়েছে এমন এক মানসিক ও আত্মিক অবস্থা, যেখানে মানুষ আল্লাহর দেওয়া অংশে সন্তুষ্ট থাকে (কানাআত), লোভ ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে, এবং তার রিজিকে বরকত অনুভব করে।ইমাম নববী (রহ.) এই হাদীস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

**"যার অন্তর সন্তুষ্ট, সে দারিদ্র্যেও ধনী; আর যার অন্তর অস্থির, সে ধনসম্পদের প্রাচুর্যেও গরিব।"**

অর্থাৎ, অন্তরের প্রশান্তি ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলই সুখের মূল।যে মানুষ নিজের অবস্থাকে মেনে নেয় এবং আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনো হতাশ হয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

**"সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যথেষ্ট রিজিক পেয়েছে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট আছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: 1054)**

এই হাদীসে রাসূল ﷺ তিনটি মূল উপাদানকে প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

1. ইমান ও ইসলামী জীবনযাপন – অন্তরে ঈমান থাকলে মানুষ জানে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত।

2. পরিমিত রিজিক – বেশি নয়, প্রয়োজনমতো রিজিকই যথেষ্ট।

3. সন্তুষ্টি (কানাআত) – যা আছে তাতেই তৃপ্ত থাকা, এবং অন্যের প্রাপ্তিতে হিংসা না করা।

এই তিনটি গুণ যার জীবনে থাকে, সে আর্থিক দিক থেকে ধনী না হলেও আত্মিকভাবে সবচেয়ে ধনী ও সুখী।

## কুরআনের আলোকে অন্তরের সমৃদ্ধি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

**"যে ব্যক্তি নেক আমল করে, সে পুরুষ হোক বা নারী— আর সে মুমিন হলে— আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।"(সূরা আন-নাহল, 16:97)**

এখানে "পবিত্র জীবন" বলতে আলেমগণ বলেন— এটি সেই জীবন যেখানে অন্তর প্রশান্ত, আত্মা তৃপ্ত, এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। এই শান্তিই প্রকৃত সুখ, যা সম্পদের দ্বারা পাওয়া যায় না।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

**"যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে, তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।" (সূরা ত্বাহা, 20:124)**

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায় এবং কেবল দুনিয়ার পেছনে দৌড়ায়, তার অন্তর কখনো শান্ত হয় না। সে যতই ধনী হোক না কেন, তার মনে সবসময় ভয়, অস্থিরতা ও অপূর্ণতা বিরাজ করে।

**আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা**

আজকের যুগে মানুষ বস্তুগত সাফল্যকে সুখের মানদণ্ড মনে করে। উন্নত প্রযুক্তি, আর্থিক উন্নতি, সামাজিক মর্যাদা — সব কিছু অর্জন করেও মানুষ মানসিকভাবে অশান্ত। অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক উন্নতি মানেই মানসিক সুখ নয়। বরং যে মানুষ নিজের জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ, পরিমিত চাহিদাসম্পন্ন ও আত্মতুষ্ট, তারাই বেশি সুখী ও মানসিকভাবে স্থিতিশীল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মানসিক শান্তির ভিত্তি ১৪০০ বছর আগে বুঝিয়ে দিয়েছেন —

সুখ কোনো বাহ্যিক অবস্থা নয়, বরং এটি এক অন্তরের অবস্থা। ইসলাম তাই শেখায়, সুখী হতে হলে প্রথমে আত্মাকে সমৃদ্ধ করতে হবে — নামাজ, জিকির ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। অন্যের প্রতি হিংসা, অসন্তোষ ও অতিরিক্ত প্রত্যাশা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। জীবনের প্রতিটি অবস্থাকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। যখন মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে, তখন তার অন্তর সমৃদ্ধ হয় এবং দুনিয়ার যেকোনো অবস্থায়ও সে শান্তি অনুভব করে।

**উপসংহার**

সুতরাং, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দৃষ্টিতে "অন্তরের সমৃদ্ধিই প্রকৃত ধন" — এটি শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষা নয়, বরং মানবজীবনের গভীর বাস্তবতা।যে মানুষ নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়, এবং জীবনের ছোট ছোট নিয়ামতে কৃতজ্ঞ থাকে, তার জীবনেই প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি নিহিত।

**"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাকেও সন্তুষ্ট করেন।"(তিরমিযি, হাদীস: 2510)**

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুখ কোনো বাহ্যিক প্রাপ্তির ফল নয়; বরং এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আত্মতৃপ্তি ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ফল। এই অন্তরেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত সম্পদ — প্রকৃত সুখের অমৃত উৎস।

৪.২ কানাআত (সন্তুষ্টি) — প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি

## ১) কানাআতের অর্থ ও ধারণা:

"কানাআত" (القناعة) অর্থ হলো নিজের অবস্থা ও যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, অতিরিক্ত লোভ বা আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকা।এটি এমন এক মানসিক অবস্থা যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে—

**"যা আল্লাহ দিয়েছেন, সেটিই আমার জন্য যথেষ্ট ও কল্যাণকর।"**

ইসলাম মনে করে কানাআতই প্রকৃত ধন-সম্পদ, কারণ এটি মানুষকে লোভ, হিংসা ও হতাশা থেকে মুক্ত রাখে।

## ২) হাদীসে কানাআতের গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**"সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, জীবিকা পর্যাপ্ত পেয়েছে, এবং যা আল্লাহ দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫৪)**

এই হাদীসে তিনটি সুখের শর্ত বলা হয়েছে —

1. **ইমান (Faith)** – সঠিক বিশ্বাসে স্থির থাকা।
2. **কাফাফ (Sufficiency)** – জীবনের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হওয়া।
3. **কানাআত (Contentment)** – যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

অর্থাৎ, প্রকৃত সুখ হলো বাহ্যিক সম্পদের নয়, বরং আত্মতৃপ্তির।

## ৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা:

তিনি বলেন —**"যে সকালে জেগে তার শরীর সুস্থ, ঘরে খাদ্য মজুত, এবং সে নিরাপদ — তার জন্য পুরো দুনিয়া হাজির হয়ে গেছে।" (তিরমিজি, হাদীস: ২৩৪৬)**

- এই হাদীস বোঝায়, মৌলিক চাহিদা পূর্ণ থাকলেই সুখী হওয়া সম্ভব।
- সুখের মানদণ্ড হলো বেশি সম্পদ নয়, বরং সন্তুষ্ট মন।

## ৪) সাহাবীদের জীবনে কানাআতের দৃষ্টান্ত:

হযরত আলী (রা.) বলেন —**"ধন-সম্পদ কম হলেও যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তবে তুমি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী।"**

হযরত উমর (রা.) বলতেন — **"দারিদ্র্য আমি ভয় করি না; ভয় করি এমন মনকে, যা কখনো তৃপ্ত হয় না।"**

তাদের জীবনে কানাআত শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা ছিল না, রং বাস্তব জীবনের অংশ। তারা দুনিয়ার ভোগে নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সুখ খুঁজতেন।

**৫) কুরআনের আলোকে সন্তুষ্টি:**

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

**"যে আল্লাহর বিধান মানে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"(সূরা আত-তালাক ৬৫:৩)**

এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর উপর ভরসা ও সন্তুষ্টিই জীবনের নিরাপত্তা ও প্রশান্তির উৎস। যে ব্যক্তি মনে করে "আমার রিজিক আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন", সে কখনো লোভে অন্ধ হয় না।

**৬) মনোবিজ্ঞানের আলোকে কানাআতের প্রভাব:**

আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলে —সুখ আসে "গ্রাটিচ্যুড" (কৃতজ্ঞতা) ও "কনটেন্টমেন্ট" (সন্তুষ্টি) থেকে। যাদের জীবনে সন্তুষ্টি আছে, তাদের মধ্যে স্ট্রেস ও ডিপ্রেশন কম।ইসলাম এই নীতিকে অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা করেছে — "যে নিজের ভাগ্যে খুশি, সে-ই মানসিকভাবে সুস্থ ও সুখী।"

**৭) কানাআতের বাস্তব উপকারিতা:**

কানাআত বা সন্তুষ্টি কেবল একটি মানসিক গুণ নয়, বরং এটি মানুষের জীবনে নানাভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। যে ব্যক্তি নিজের অবস্থা ও প্রাপ্তিতে তুষ্ট থাকে, সে ধীরে ধীরে এমন এক মানসিক প্রশান্তি অর্জন করে যা কোনো বস্তুগত সম্পদে পাওয়া সম্ভব নয়।

- প্রথমত, আধ্যাত্মিক দিক থেকে, কানাআত মানুষকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতে শেখায়।যখন কেউ মনে করে "আমার যা আছে, সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত ও উত্তম", তখন তার মনে হতাশা, হিংসা বা লোভ থাকে না।সে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, ফলে তার ঈমান আরও দৃঢ় হয়।
- দ্বিতীয়ত, মানসিক দিক থেকে, সন্তুষ্টি মানুষের অন্তরকে শান্ত করে।যে ব্যক্তি সবসময় অন্যের জীবনের সাথে নিজের তুলনা করে, সে কখনো শান্তি পায় না।কিন্তু কানাআত অর্জনকারী ব্যক্তি তার জীবনের ছোট ছোট নিয়ামতগুলো উপলব্ধি করে, কৃতজ্ঞ থাকে, এবং ইতিবাচকভাবে চিন্তা করে। ফলে তার জীবনে উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা অনেক কমে যায়।
- তৃতীয়ত, সামাজিক জীবনে, কানাআত সমাজে নৈতিক ভারসাম্য তৈরি করে।যখন সবাই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, তখন হিংসা, প্রতিযোগিতা, অনৈতিক লোভ বা দুর্নীতি কমে যায়। মানুষ একে অপরের কল্যাণে আগ্রহী হয়, কারণ সে জানে— সুখ মানে শুধু "আরও পাওয়া" নয়, বরং "যা আছে তা উপভোগ করা"।

- চতুর্থত, নৈতিক দিক থেকে, সন্তুষ্ট মানুষ সহজেই দানশীল ও উদার হয়।কারণ তার মনে অভাবের ভয় থাকে না। সে মনে করে, "আল্লাহ দিয়েছেন, আবার দেবেন।"এই মনোভাব মানুষকে লোভ থেকে মুক্ত করে, সমাজে দান ও ত্যাগের সংস্কৃতি গড়ে তোলে।
- সবশেষে বলা যায়, কানাআত এমন এক গুণ যা জীবনের সব দিকেই প্রশান্তি এনে দেয়।এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, অন্তরকে শান্ত রাখে, সমাজে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে, আর নৈতিকতা ও মানবিকতার বিকাশ ঘটায়।যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্যে তুষ্ট থাকে, তার মুখে হাসি থাকে, মনে থাকে কৃতজ্ঞতা, আর জীবনে থাকে প্রকৃত সুখ ও পরিতৃপ্তি।

**৮) কানাআতের অভাবের ক্ষতি:**

লোভ, হিংসা ও অবিরাম তুলনা মানুষকে মানসিকভাবে অশান্ত করে তোলে। এমন ব্যক্তি কখনো কৃতজ্ঞ হয় না, ফলে আল্লাহর নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত হয়।

কুরআনে বলা হয়েছে —

**"যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি কঠোর।" (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৭)**

**৯)উপসংহার:**

কানাআত মানুষকে মুক্ত করে অস্থিরতা, হতাশা ও তুলনার আগুন থেকে।এটি তাকে করে আল্লাহমুখী, কৃতজ্ঞ, এবং মানসিকভাবে পরিপূর্ণ।প্রকৃত সুখ তাই বস্তু নয়, বরং অনুভবের নাম—যা আল্লাহর উপর আস্থা ও নিজের ভাগ্যে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**"যে আল্লাহর দেওয়া অংশে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তাকেও সন্তুষ্ট রাখেন।" (তিরমিজি, হাদীস: ২৩১১)**

অতএব, কানাআতই প্রকৃত সুখের মূল রহস্য। যে ব্যক্তি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, সে-ই ধনী, সে-ই সুখী, সে-ই সফল — যদিও তার কাছে দুনিয়ার ধনভাণ্ডার না থাকে।

৪.৩ : সত্যিকার ধনী কে? (হাদীসের আলোকে)

**ভূমিকা:**

মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি, পদমর্যাদা বা সামাজিক প্রভাবকে ধনীর পরিচায়ক মনে করে।কিন্তু ইসলাম এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।ইসলামে "ধনী" বলা হয় না সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে অর্থ অনেক; বরং "ধনী" সে, যার অন্তর তুষ্ট, আত্মা শান্ত, আর আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।রাসূলুল্লাহ ﷺ এই গভীর সত্যটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রভাবশালীভাবে প্রকাশ করেছেন।

প্রধান হাদীস:

**“ধনসম্পদ অধিকতার দ্বারা নয়; বরং প্রকৃত ধনসম্পদ হলো আত্মার ধনী হওয়া।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫১)**

এই হাদীস ইসলামের সুখ-সমৃদ্ধি ধারণার মূলে অবস্থান করছে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় তার অন্তরের প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির দ্বারা, অর্থ দ্বারা নয়।

বিস্তারিত বিশ্লেষণ:

**১) ধন-সম্পদের প্রকৃত মানদণ্ড:**

ইসলাম মানুষের ধন পরিমাপ করে না তার সম্পদের পরিমাণে, বরং তার অন্তরের প্রশান্তিতে। যে ব্যক্তি ধনী হয়েও অস্থির, অসন্তুষ্ট ও লোভী, সে প্রকৃত অর্থে দরিদ্র। অন্যদিকে যে ব্যক্তি অল্পে খুশি, তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ, সে-ই সত্যিকারের ধনী।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে রিজিক দান করেন।” (সূরা আত-তালাক ৬৫:২-৩)**

অর্থাৎ ধনসম্পদের প্রকৃত উৎস আল্লাহ। মানুষ যতই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক, প্রকৃত প্রাচুর্য আসে তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে।

**২) আত্মার সমৃদ্ধি: সুখের আসল ভিত্তি:**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, জীবিকা পর্যাপ্ত পেয়েছে এবং যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫৪)**

এখানে ‘সফল’ বা ‘সুখী’ হওয়ার তিনটি স্তম্ভ বলা হয়েছে—

1. ইমান: ইসলামী জীবন গ্রহণ করা।
2. পর্যাপ্ত জীবিকা: মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া।
3. সন্তুষ্টি: আল্লাহর ফয়সালায় তুষ্ট থাকা।

এই তিনটি বিষয় মিলেই আত্মার সমৃদ্ধি গড়ে তোলে।

**৩) লোভ ও অসন্তুষ্টি: মানসিক দারিদ্র্যের কারণ**

যে ব্যক্তি সবসময় আরও পাওয়ার চিন্তায় অস্থির, সে কখনো শান্ত হতে পারে না।হাদীসে এসেছে—

**“মানুষের এক উপত্যকা স্বর্ণ থাকলে, সে আরেকটি চায়; তার পেট ভরবে না মাটিই ছাড়া।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৪৮)**

এই হাদীস স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে, ধনসম্পদের লোভ সীমাহীন। এ লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষ বাহ্যিকভাবে ধনী হলেও মানসিকভাবে দরিদ্র হয়ে যায়।

**৪) ধনসম্পদের সঠিক ব্যবহারই প্রকৃত সম্পদ:**

ইসলাম ধন অর্জনকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং আল্লাহর বিধি মেনে হালাল উপায়ে রোজগার করা এবং তা সঠিকভাবে ব্যয় করাকেই উৎসাহ দিয়েছে। ধন তখনই বরকতময় হয়, যখন তা দানে, সাহায্যে, সমাজকল্যাণে ও ন্যায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**"আদম সন্তান বলে, 'আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!' অথচ তোমার সম্পদ কেবল সেই যা তুমি খেয়ে শেষ করেছো, পরিধান করেছো, বা দান করেছো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯৫৮)**

অর্থাৎ সম্পদের আসল মূল্য তখনই, যখন তা উপকারী কাজে ব্যবহার হয়। অন্যথায় অব্যবহৃত ধন কেবল হিসাবের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

**৫) ধন-সম্পদ নয়, নৈতিকতা ও ঈমানই প্রকৃত প্রাচুর্য**

ইসলামে ধনী বলতে বোঝানো হয়েছে সেই ব্যক্তিকে, যে আল্লাহর অনুগ্রহে কৃতজ্ঞ, অন্যের প্রতি সদয় ও ন্যায়পরায়ণ।হাদীসে এসেছে—

**"আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদ দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও কর্ম দেখেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৪)**

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে মূল্যবান সেই মানুষ, যার হৃদয়ে তাকওয়া ও আন্তরিকতা আছে; সম্পদের প্রাচুর্য নয়।

**৬) আত্মতৃপ্তিই প্রকৃত ধন**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

**"যে ব্যক্তি সকালে নিরাপদ অবস্থায় জাগে, যার শরীর সুস্থ এবং একদিনের খাবার তার কাছে আছে, সে যেন পুরো দুনিয়া পেয়ে গেছে।" (সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২৩৪৬)**

এই হাদীস শেখায়, প্রকৃত সুখ ও ধন হলো জীবন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক চাহিদা পূর্ণ হওয়া। এর বাইরে যা কিছু, তা কেবল বাড়তি নিয়ামত।

**উপসংহার:**

ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী মানে সেই ব্যক্তি নয়, যার ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি;বরং সেই ব্যক্তি ধনী, যার হৃদয় লোভমুক্ত, মন শান্ত, ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।আত্মিক প্রশান্তিই প্রকৃত সম্পদ, আর এই সম্পদ লাভ করা যায় তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও কানাআতের

মাধ্যমে।যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় তুষ্ট থাকে, তার কাছে এই দুনিয়াও জান্নাতের মতো শান্তিময় হয়ে যায়।

৪.৪ : ইহকাল ও পরকালীন ভারসাম্য (হাদীসের আলোকে)

**ভূমিকা:**

ইসলাম মানুষকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারার শিক্ষা দেয়।এ ধর্ম মানুষকে কেবল আখিরাতমুখী সন্ন্যাসী বানায় না, আবার কেবল দুনিয়ামুখী ভোগবাদেও নিমজ্জিত করে না।

বরং ইসলাম বলে — "দুনিয়ায় এমনভাবে বাস করো যেন তুমি চিরকাল বাঁচবে, আর আখিরাতের জন্য এমন কাজ করো যেন কালই মারা যাবে।"এই চমৎকার ভারসাম্যই ইসলামের সুখ ও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

**১) ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন একটি দ্বিমাত্রিক বাস্তবতা**

মানুষের জীবন দুটি স্তরে বিভক্ত —

1. **দুনিয়া (ইহকাল):** সাময়িক পরীক্ষা ও দায়িত্বের ক্ষেত্র।
2. **আখিরাত (পরকাল):** চিরস্থায়ী পুরস্কার বা শাস্তির স্থান।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**"তুমি যে পরকালকে অগ্রাধিকার দাও, সেটিই উত্তম ও স্থায়ী।" (সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬–১৭)**

অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা চিরস্থায়ী নয়। আখিরাতই মানুষের আসল গন্তব্য। তাই দুনিয়ার কাজে আখিরাতের চিন্তা থাকা আবশ্যক।

**২) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদৃষ্টি**

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা করতেন।তিনি ইবাদত করতেন গভীর রাত পর্যন্ত, আবার সমাজ ও পরিবারের দায়িত্বও পালন করতেন পরিপূর্ণভাবে।

একদল সাহাবী দীর্ঘ রোজা রাখার, সারারাত নামাজ পড়ার ও স্ত্রী থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন —

**"আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তবু আমি রোজা রাখি, আবার ভাঙিও; নামাজ পড়ি, আবার বিশ্রামও নিই; এবং আমি বিবাহও করি। যে আমার পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪০১)**

এ হাদীস প্রমাণ করে যে ইসলাম অতিরিক্ত কষ্টভোগ নয়, বরং ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত ও জীবনযাপনকে উৎসাহ দেয়।

**৩) দুনিয়া উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়**

ইসলাম দুনিয়ার নিয়ামত উপভোগ করাকে পাপ বলে না; বরং সেগুলোকে আল্লাহর দান হিসেবে গ্রহণ করতে বলে।কিন্তু শর্ত হলো — এ নিয়ামত যেন আল্লাহর অবাধ্যতার পথে ব্যবহার না হয়। আল্লাহ বলেন —

**"বলুন, কে আল্লাহর সেই সৌন্দর্য ও রিজিক নিষিদ্ধ করেছে যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩২)**

অতএব, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস শরীয়তের সীমার মধ্যে হলে তা ইবাদতের অংশই হয়ে যায়।

**৪) আখিরাতের চিন্তা দুনিয়াকে সঠিক পথে চালিত করে**

যে ব্যক্তি জানে, তাকে একদিন আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে —সে কখনো অন্যের হক খায় না, প্রতারণা করে না, অন্যায় করে না।এই আখিরাতচেতনা (Akhirah-consciousness) মানুষকে সৎ রাখে, দায়িত্বশীল করে, আর সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।"(সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২৪৫৯)**

অর্থাৎ, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হলো দুনিয়াকে ব্যবহার করা আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য।

**৫) দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির পরিণতি**

যখন মানুষ কেবল দুনিয়ার সুখে ডুবে যায়, তখন তার অন্তর আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবেসেছো, অথচ পরকালই উত্তম ও স্থায়ী।"(সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬–১৭)**

আল্লাহ আরও বলেন — **"এই দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা তাকওয়াবান, তাদের জন্য পরকালই উত্তম।" (সূরা আনআম ৬:৩২)**

অতএব, দুনিয়ায় সফল হতে হলেও আখিরাতের চেতনা অপরিহার্য; নয়তো মানুষ সুখের সন্ধানে থেকেও চিরস্থায়ী অসন্তুষ্টিতে ভোগে।

**৬) ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের ফলাফল: প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি**

যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রাখে, তার জীবনে শান্তি আসে।সে জানে — দুনিয়ার সাফল্য সাময়িক, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই চিরস্থায়ী সুখ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“এই দুনিয়া হচ্ছে মু’মিনের জন্য কারাগার, আর কাফেরের জন্য জান্নাত।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯৫৬)**

অর্থাৎ, মুমিনের জীবনে সীমাবদ্ধতা থাকলেও তার অন্তর মুক্ত ও শান্ত থাকে, কারণ সে জানে আখিরাতে তার প্রকৃত মুক্তি অপেক্ষা করছে।

**উপসংহার:**

ইসলাম শেখায়, সুখের প্রকৃত পথ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।শুধু দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিলে মানুষ হতাশ ও লোভী হয়ে পড়ে;আর কেবল আখিরাতের চিন্তায় দুনিয়ার দায়িত্ব ভুলে গেলে সমাজ ও পরিবারে ভারসাম্য নষ্ট হয়।প্রকৃত সুখ আসে তখনই, যখন মানুষ দুনিয়ার কাজ করে আখিরাতের উদ্দেশ্যে, আর আখিরাতের প্রস্তুতি নেয় দুনিয়ার বাস্তবতার ভেতর থেকেই।এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের মূল শিক্ষা — ভারসাম্য, কৃতজ্ঞতা ও ঈমাননিষ্ঠ জীবন।

### ৪.৫ : পারিবারিক সম্পর্ক ও সুখ (পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান)

**ভূমিকা:**

মানুষ সামাজিক জীব। তার জীবনের সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে পারিবারিক সম্পর্কের ওপর।ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখেছে এবং পারিবারিক বন্ধন রক্ষাকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও ভালোবাসা—এসবই প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি।

**১) পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য: প্রকৃত সুখের প্রথম ধাপ:**

- কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**“তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না, এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।” (সূরা আল-ইসরা ১৭:২৩)**

এই আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তাদের সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

◇ হাদীসের দৃষ্টিতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“পিতা-মাতা যে সন্তানের জন্য সন্তুষ্ট, সে সন্তানের ওপর আল্লাহও সন্তুষ্ট। আর পিতা-মাতা যদি অসন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।” (তিরমিযী, হাদীস: ১৮৯৯)**

এই হাদীস শেখায়—

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জীবনের বরকতের উৎস।তাদের অবহেলা করলে অন্তর অশান্ত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতি হয়।

বাস্তব শিক্ষা

পিতা-মাতাকে শুধু আর্থিকভাবে নয়, মানসিক ও আবেগিকভাবে সঙ্গ দেওয়া —তাদের পাশে থাকা, যত্ন নেওয়া, দোয়া করা — এ সবই প্রকৃত সুখের উৎস।

একজন সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হলো পিতা-মাতার সন্তুষ্টি।

**২) স্ত্রী-স্বামীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া: শান্তির ঘর গড়ার ভিত্তি**

কুরআনের ভাষায়

আল্লাহ বলেন —

**“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো—তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন সঙ্গিনী, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও;আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আর-রূম ৩০:২১)**

এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে —

1. **সঙ্গীত্ব** (companionship) – একে অপরের পাশে থাকা।
2. **মওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)** – হৃদয়ের টান ও মমতা।
3. **রহমাহ (দয়া)** – ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা।

নবী ﷺ এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।” (তিরমিযী, হাদীস: ৩৮৯৫)**

তিনি নিজে ছিলেন স্ত্রীদের প্রতি অতি কোমল, শ্রদ্ধাশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ। তিনি ঘরের কাজেও সাহায্য করতেন, হাসিমুখে কথা বলতেন, কারো মন ভাঙতেন না।

শিক্ষা:

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে পরিবারে সুখ, সন্তুষ্টি ও স্থিতি আসে। পারিবারিক শান্তি হারালে দুনিয়ার কোনো আরামও প্রকৃত সুখ দিতে পারে না।

**৩) সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও দিকনির্দেশনা: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখের বীজ**

পিতা-মাতা সন্তানের রক্ষক

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।নেতা তার প্রজাদের রাখাল; পুরুষ তার পরিবারের রাখাল;নারী তার স্বামীর গৃহের রাখাল; আর প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।”(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮২৯)**

অর্থাৎ, সন্তানের নৈতিক, ধর্মীয় ও মানসিক বিকাশের দায়িত্ব পিতা-মাতার।শুধু খাওয়ানো বা পোশাক নয়, সততা, ঈমান, চরিত্রগঠন শেখানোই আসল দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“সন্তানকে ভালোবাসা রহমতের অংশ।”তিনি এমনকি ছোট বাচ্চাদের কপালে চুমু দিতেন, কোলে নিতেন।(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৯৯৮)**

শিক্ষা:

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা ইবাদতের সমান।ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার বীজ জন্মায়।

**৪) পারিবারিক সম্পর্কের অবহেলার ক্ষতি**

যে সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়, সেখানে —আত্মিক শান্তি হারিয়ে যায়,সমাজে একাকিত্ব, অপরাধ ও অবিশ্বাস বাড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন —

**“যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৫৬)**

অতএব, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা শুধু মানসিক কষ্টই নয়, আখিরাতের ক্ষতিও বয়ে আনে।

**৫) পারিবারিক ঐক্য: দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের সেতুবন্ধন**

পরিবারে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহনশীলতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা করলে —ঘরে থাকে প্রশান্তি,সন্তান হয় নৈতিক ও সফল,সমাজে ছড়ায় শান্তি ও সৌন্দর্য।

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

**“যারা ঈমান আনে ও তাদের সন্তানরা ঈমানের পথে চলে, আমি তাদের বংশধরদেরও তাদের সঙ্গে যুক্ত করব।”(সূরা আত-তূর ৫২:২১)**

এই আয়াত বোঝায় — আখিরাতেও একত্রে থাকার সুখ পেতে হলে দুনিয়ায় পরিবারকে ঈমান ও নৈতিকতার পথে রাখতে হবে।

**উপসংহার:**

পরিবার সুখের প্রথম ও প্রধান পাঠশালা।পিতা-মাতার দোয়া, স্ত্রী-স্বামীর ভালোবাসা ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব — এই তিনের মিলেই গড়ে ওঠে প্রকৃত সুখের জীবন।হাদীসের আলোকে দেখা যায়, পরিবার শুধু সামাজিক প্রয়োজন নয়; এটি ইবাদতের অংশ।যে পরিবারে দয়া, শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও ঈমান আছে — সেখানেই আল্লাহর রহমত ও প্রকৃত সুখ নেমে আসে।

৪.৬ : সৎ সঙ্গ ও নৈতিক জীবন

**ভূমিকা:**

মানুষের চরিত্র ও মানসিকতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার সঙ্গী ও পরিবেশের ওপর।ভালো মানুষদের সঙ্গ যেমন অন্তরে শান্তি ও সঠিক পথে চলার শক্তি দেয়,তেমনি খারাপ সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে নৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।ইসলাম সৎ সঙ্গ ও নৈতিক জীবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সৎ বন্ধু বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং নৈতিক চরিত্রকেই প্রকৃত সুখের মূল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

**১) সৎ সঙ্গের গুরুত্ব: বন্ধুত্ব চরিত্রের আয়না**

**হাদীসের আলোকে**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

**“ভালো ও মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো আতর বিক্রেতা ও কামারের দৃষ্টান্তের মতো।আতর বিক্রেতার কাছে গেলে তুমি হয় আতর পাবে, নয় অন্তত তার সুগন্ধ পাবে।কিন্তু কামারের কাছে গেলে হয় পোশাকে আগুনের ছিটে পড়বে, নয়তো দুর্গন্ধ লাগবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২১০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬২৮)**

এই হাদীস বোঝায় —

- ভালো সঙ্গ মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে,
- আর খারাপ সঙ্গ তাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলে।

সুতরাং, সৎ সঙ্গ হলো আত্মিক প্রশান্তির এক অমূল্য উৎস।

**কুরআনের দৃষ্টিতে**

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থেকো।”(সূরা আত-তাওবা ৯:১১৯)**

এ আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, সৎ মানুষের সংস্পর্শে থাকলে ঈমান শক্ত হয়, আর মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে থাকলে অন্তর কলুষিত হয়।

বাস্তব শিক্ষা

সৎ বন্ধু আল্লাহর পথে ডাকে, কষ্টে পাশে দাঁড়ায়, ভুল হলে সুন্দরভাবে সতর্ক করে।তার সঙ্গে মেলামেশা করলে অন্তরে শান্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মে।এমন সঙ্গীই প্রকৃত সুখের সাথী।

**২) নৈতিক জীবন: অন্তরের প্রশান্তি ও সমাজের সৌন্দর্য**

ইসলাম বলে— প্রকৃত সুখ শুধু ধন-সম্পদে নয়, বরং নৈতিক চরিত্রে।নৈতিক জীবন মানে হলো এমন এক জীবন যেখানে সততা, ধৈর্য, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার ও আত্মসংযম বিদ্যমান।

◇ **রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

**“মু’মিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০৩৫)**

আরেক হাদীসে তিনি বলেন —

**“তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। কোনো মন্দ কাজ করলে তার পর ভালো কাজ করো, যা সেটিকে মুছে দেবে।আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।” (তিরমিযী, হাদীস: ১৯৮৭)**

এই হাদীস শেখায় —

- নৈতিক আচরণ শুধু সমাজে মর্যাদা আনে না, বরং আত্মার প্রশান্তি দেয়।
- সৎ, দয়ালু ও নম্র মানুষই আল্লাহর নিকট প্রিয় ও সফল।

**৩) সৎ সঙ্গ ও নৈতিকতার সম্পর্ক**

- সৎ সঙ্গ ও নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক।
- সৎ বন্ধু চরিত্র গঠনে সাহায্য করে,
- নৈতিকতা তোমাকে সৎ সঙ্গ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

**“বন্ধুরা সেদিন (কিয়ামতের দিন) একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকিরা (পরহেজগাররা) ছাড়া।” (সূরা যুখরুফ ৪৩:৬৭)**

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয়—যে বন্ধুত্ব আল্লাহর ভয় ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত, কেবল সেই বন্ধুত্বই আখিরাতে টিকে থাকবে।

**৪)খারাপ সঙ্গ ও নৈতিক অধঃপতনের ক্ষতি**

রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন —

**“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ওপর চলে।অতএব তোমরা দেখে নাও, তোমাদের বন্ধু কারা।” (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩; তিরমিযী, হাদীস: ২৩৭৮)**

অর্থাৎ, যদি বন্ধুরা অন্যায়, প্রতারণা বা অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, তবে ধীরে ধীরে তুমিও তেমন হয়ে যাবে। খারাপ সঙ্গ শুধু ঈমান নষ্ট করে না, বরং মনকেও অশান্ত করে তোলে।

**৫) নৈতিক জীবন যাপনকারীর সুখ ও পুরস্কার**

আল্লাহ বলেন —

**“যে সৎকর্ম করে—পুরুষ হোক বা নারী—এবং সে ঈমানদার, আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব। আর তাদেরকে তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিফল দিব।”(সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭)**

এই আয়াতে “সুন্দর জীবন” বলতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ায় অন্তরের প্রশান্তি ও আখিরাতে জান্নাত।

অতএব, নৈতিক জীবনের ফল শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়াতেও প্রকৃত সুখ এনে দেয়।

**৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের জীবনে সৎ সঙ্গ ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত**

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সততার শিক্ষা দিয়েছেন।সাহাবারা একে অপরের ভুল ধরিয়ে দিতেন, কিন্তু কখনো হেয় করতেন না। তারা সততা, দয়া ও পরোপকারিতার মাধ্যমে এক নৈতিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত আবু বকর (রা.) সর্বদা নবী ﷺ-এর পাশে ছিলেন সত্য ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে। হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক, যিনি বলতেন—“যদি নদীর তীরে একটি গাধাও ক্ষুধায় মরে, আমি ভয় করি আল্লাহ আমাকে তার জন্য প্রশ্ন করবেন।” এমন নৈতিক চেতনা ও সৎ সঙ্গের কারণেই তারা দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

**উপসংহার:**

সৎ সঙ্গ ও নৈতিক জীবন হচ্ছে সেই দুই ডানা, যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তির আকাশে উড়তে পারে।খারাপ সঙ্গ ও নৈতিক অবক্ষয় যতই বাহ্যিক আনন্দ

দিক না কেন, তা অন্তরের শান্তি কেড়ে নেয়।কিন্তু সৎ বন্ধু, সততা, দয়া ও ঈমানের ওপর ভিত্তি করে গঠিত জীবন মানুষকে দেয়— আল্লাহর নিকট প্রিয়তা, সমাজে সম্মান, এবং আত্মার প্রকৃত সুখ।

## অধ্যায় ৫- ইসলাম-পূর্ব যুগ বনাম ইসলামের দৃষ্টিকোণ

### ৫.১ জাহেলিয়াত যুগে সুখের ধারণা

**ভূমিকা**

ইসলাম পূর্ববর্তী আরব সমাজ—সাধারণত 'জাহেলিয়ত' নামে পরিচিত—ছিল সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিভ্রান্তিতে ভরা একটি কাঠামো। জাহেলিয়ত শব্দের মূল অর্থ 'অজ্ঞতা' বা 'অবজ্ঞা'। এই যুগে মানুষ সুখ-শান্তি, সম্মান ও নিরাপত্তা খুঁজেছে প্রধানত বহির্মুখী, ক্ষণস্থায়ী এবং গোত্রভিত্তিক মানদণ্ডে। নিচে জাহেলিয়াত-জুগের সুখের ধারণার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণভাবে দেওয়া হলো

**১) সমাজগত কাঠামো ও সুখের উৎস**

জাহেলিয়ত আরব একটি গোত্রভিত্তিক (tribal) সমাজ ছিল। এখানে ব্যক্তির মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সুখ-অনুভূতি নিম্নোক্ত উৎসে নির্ভর করত—

**গোত্রগৌরব (Tribal prestige):** মানুষের অধিকাংশ সুখ অনুভব ছিল তার গোত্রের শক্তি ও সম্মানে। গোত্র-শক্তি বেশি হলে নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা মিলত; ফলে লোকেরা ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে গোত্র-গৌরব বাড়ানোর প্রতি অনুপ্রাণিত ছিল।

**বীরত্ব ও যোদ্ধা-গৌরব:** যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বীরত্বকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ধরা হতো; বিজয়ে আনন্দ, পরাজয়ের ফলে লজ্জা। ভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে বিজয় কেবল অর্থগত নয়, মানসিক "সুখ"ও এনে দিত।

**ঐতিহ্য—কবিতা ও সাহিত্যে স্বীকৃতি:** কবি ও লেখক দের কাব্যের মাধ্যমে গৌরব অর্জন করত; কাব্য-গৌরবও সুখের উৎস ছিল।

**ধন-সম্পদ ও গৃহসম্পদ:** সস্ত্রীক স্তম্ভের মতো ধন, গবাদি-পশু, প্রাচুর্যকে সুখের চিহ্ন ধরা হতো; সম্পদ-সংগ্রহ মর্যাদায় রূপ নিত।এই সমস্তই ছিল সমাজিক/বাহ্যিক সূচক; অর্থাৎ সুখের পরিমাপ বাহ্যিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

**২) ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠানগত উৎস (পার্থিব ইবাদত ও মূর্তিপূজা)**

জাহেলিয়ত আরব ছিলেন বহুদেববাদী; কাবা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানে অনেক মূর্তি আর দেবতা ছিল। তাদের সুখের কিছু উৎস ছিল—

**বহুমূর্তিপূজা ও দেবতাবিশ্বাস:** দেবতাদের সন্তুষ্টি পেলে সাফল্য, সন্তান, বিজয় ইত্যাদি আসবে—এ ধরনের আধ্যাত্মিক সুবিধাবাদ ছিল।

**শরীরচর্চা ও ভোগ-উপভোগ:** মদ-পান, জুয়ার মতো কার্যকলাপ আনন্দ-সুত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল (যা পরে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা পায়)।

**রিতু ও প্রথা:** সামাজিক অনুশাসন, সম্মেলন, জমানো ঐতিহ্য—এসবই মানুষের আনন্দ-বিলাসের উপায় ছিল।কিন্তু এ সব ধর্মীয় আচারচরিত্রই আধ্যাত্মিক গভীরতা বঞ্চিত ছিল; তারা সুখকে বাহ্যিক 'দেবতার সন্তুষ্টি' বা সামাজিক সম্মান থেকে খুঁজত, যাহা স্থায়ী শান্তি দেয়নি। (কুরআনের নানাবিধ আয়াত এই প্রথাগুলোর সমালোচনা করে)।

**৩) নারীর সামাজিক অবস্থান ও সুখের বর্ণনা**

জাহেলিয়াতে নারীর মর্যাদা ছিল নিম্ন। কন্যা-শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া (female infanticide)-র মতো নিষ্ঠুর প্রথা দেখা যেত—এ ধরনের সংস্কার আত্মিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। ফলে সমাজে সুখের ধারণা বহু ক্ষেত্রে পুরুষ-কেন্দ্রিক: সন্তানের সংখ্যা (বিশেষত পুত্র), বংশবিস্তারের গৌরব। মহিলা ছিল পরিবারের সম্মান ও সামাজিক শক্তির 'প্রতীক' হিসেবে; তাদের নিপীড়ন সমাজকে নৈতিকভাবে খর্ব করেছিল। কুরআনে মেয়েদের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা উল্লিখিত ও নিন্দিত হয়েছে।

**৪) অর্থনীতি, অর্থচর্চা ও সুখ**

জাহেলিয়ত অর্থনীতিতে—প্রচুর ঝুঁকিপূর্ণ প্রথা ছিল:

**অস্বাস্থ্যকর আর্থিক অভ্যাস:** সুদ-বহুল চর্চা (usury), সম্পদ সংরক্ষণ ও অহেতুক প্রাচুর্য-চাগলাকৃতি বিদ্যমান ছিল।

**দাসত্ব ও শ্রমের শোষণ:** দাসপ্রথা প্রচলিত; শ্রেণিবিভাজন ও অধিকারহীনতা সুখকে নির্ভরশীল করছিল মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ওপর।

**গৃহীত নৈতিকতার অভাব:** সম্পদই সর্বোচ্চ, নৈতিক দায়বোধ—কম। ফলে সাময়িক ভোগ হলেও স্থায়ী কল্যাণ জন্মায় না।

**৫) ন্যায়-অনুশাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা:**

জাহেলিয়াত সমাজে প্রতিশোধ  ও গোত্রীয় রক্তশোধের প্রথা ছিল—এগুলো নিরাপত্তা অনুভূতিকে দুর্বল করত। যখন প্রত্যেক মুহূর্তে বলাই থাকে 'আমার/আমাদের প্রতিদান', তখন সমাজে স্থায়ী শান্তি ও স্থিরতা আসে না। এর ফলে সুখ এক বিরূপ,

অনিশ্চিত ও বিভক্ত অভিজ্ঞতা ছিল—কখনো আনন্দ, তবে মুহূর্তেই শঙ্কা ও ঘৃণা ফিরে আসে।

**৬) ব্যক্তিগত–সামাজিক মনস্তত্ত্ব: সুখের ক্ষণস্থায়ীত্ব**

সংক্ষেপে—জাহেলিয়াত যুগের সুখ ছিল ক্ষণস্থায়ী, বাহ্যিক ও সংঘাতমুখী:বহু মানুষ ভোগ-বিলাস ও বহির্মুখী মর্যাদায় আনন্দ পেত, কিন্তু অন্তরে স্থায়ী প্রশান্তি গড়ে ওঠেনি।একদিকে প্রতিযোগিতা, হিংসা, অনৈতিক প্রচেষ্টা; অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জড়তা—এই দুইয়ের মিশ্রণ সামাজিক অস্থিরতার কারণ ছিল। ফলে 'সুখ' ছিল বিভাজিত ও অসম্পূর্ণ—সংক্ষিপ্ত আনন্দ থাকলেও তা এলাকার শান্তি/নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ ছিল।

**৭) জাহেলিয়াত সুখের ফলাফল—একটি নৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ**

জাহেলিয়াত যুগের সুখের উপর ভিত্তি করে কিছু নিম্নোক্ত বিরূপ পরিণতি দেখা গিয়েছিল **মানবাধিকারের দুর্বলতা:** নারীর অধিকার, অনাথ ও দরিদ্রদের সুরক্ষা কমে যাওয়া; এই সবই সামাজিক কষ্ট বাড়ায়।

**দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা:** রক্তারক্তি,প্রতিশোধ ও দুর্বল আইনি কাঠামো সমাজকে স্থিতিশীল রাখে না। **আধ্যাত্মিক শূন্যতা:** বহুমূর্তিপূজা ও রীতি-নীতি আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দিতে ব্যর্থ; মানুষের অন্তরে একাকিত্ব ও অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়।

**৮) সংক্ষেপে: জাহেলিয়াত-জুগের সুখের বৈশিষ্ট্যসমূহ**

1. গোত্র-গৌরব ও সামাজিক মর্যাদা প্রধান সুখ-কাঠামো।
2. বীরত্ব ও যুদ্ধজয়কে আনন্দের উৎস মনে করা হত।
3. ধন-সম্পদ ও গবাদিপশু-সংগ্রহ সুখের মাপকাঠি।
4. বহুমূর্তিপূজা, মদ-জুয়া ইত্যাদি ভোগ-চর্চা প্রচলিত।
5. নারীর অবমাননা (কন্যাভিক্ষেপ ইত্যাদি) ও লিঙ্গভিত্তিক অমানবিক আচরণ।
6. প্রতিশোধমূলক সামাজিক ব্যবস্থা—নিরাপত্তায় অভাব।
7. আধ্যাত্মিক গভীরতার অনুপস্থিতি—অন্তরের প্রশান্তি অপ্রাপ্ত।

জাহেলিয়াতের উপর এই সমালোচনার ফলে ইসলামই আনল সুখের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি — যেটি বাহ্যিক নয়, অন্তরের, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায়-ভিত্তিক, এবং স্থায়ী শান্তির দিকে নির্দেশ করে।

৫.২: ইসলাম আগমনের পর নতুন সংজ্ঞা

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজে সুখের ধারণা ছিল মূলত ভোগ-বিলাস, প্রতিশোধ, সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইসলাম সেই

মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে সুখের ধারণাকে এক নতুন, শাশ্বত ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি দেয়। ইসলাম মানুষকে শেখায় যে সত্যিকারের সুখ বস্তুগত নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির মধ্যে নিহিত।

**১. সুখের ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন**

ইসলামের আগমনের পর "সুখ" আর বাহ্যিক অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নবী করিম ﷺ মানুষকে শিখিয়েছেন—**"সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যথেষ্ট রিজিক পেয়েছে, এবং যা তাকে আল্লাহ দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকেছে।"( সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫৪)**

এখানে সুখের সংজ্ঞা তিনটি মূল উপাদানে নির্ভর করে—

1.আন্তরিক ঈমান (Faith)

2. পর্যাপ্ত রিজিক (Content livelihood)

3.সন্তুষ্টি বা কানাআত (Contentment)

অর্থাৎ সুখ মানে এখন আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে তুষ্ট থাকা, অহংকার ও লোভ থেকে মুক্ত থাকা।

**২. দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য**

ইসলাম মানুষকে শুধুমাত্র দুনিয়া বা শুধুমাত্র আখিরাতের দিকে নয়, বরং উভয়ের ভারসাম্য রাখতে নির্দেশ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে—

**"তুমি দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না; আর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও অনুগ্রহ কর।" (সূরা কাসাস 28:77)**

অর্থাৎ সুখের জন্য দুনিয়ার জীবনও প্রয়োজন, তবে তা যেন আখিরাতের ক্ষতির কারণ না হয়। ইসলাম তাই সন্তুলিত জীবনযাপনকে প্রকৃত সুখের অংশ হিসেবে তুলে ধরে।

**৩. আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহর স্মরণ**

ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে প্রকৃত প্রশান্তি আল্লাহর স্মরণেই নিহিত।

**"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি পায়।" (সূরা রা'দ 13:28)**

এর মাধ্যমে ইসলাম ঘোষণা করে যে, আত্মার তৃপ্তি ছাড়া কোনো বস্তুগত অর্জন মানুষকে সুখ দিতে পারে না। তাই ইসলাম সুখকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সাথে সংযুক্ত করেছে।

**৪. নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে সুখ**

ইসলাম সুখকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং সামাজিক দায়িত্বের সাথেও যুক্ত করেছে। যে সমাজে ন্যায়, সততা, সহানুভূতি ও দানশীলতা আছে—সেই সমাজেই প্রকৃত সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা চায়, তা তার ভাইয়ের জন্যও চায়।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৩)**এই হাদীস সুখকে আত্মকেন্দ্রিক নয়, বরং পরার্থপরতার ভিত্তিতে গঠিত এক নৈতিক আদর্শে রূপান্তরিত করেছে।

**৫. সুখের আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি**

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আখিরাতকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ জানে যে, দুনিয়ার জীবনের সুখ সাময়িক; প্রকৃত সুখ হলো জান্নাতের অনন্ত সুখ।

**“যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে, সে-ই সফল।” (সূরা আলে ইমরান 3:185)**

অতএব, ইসলাম মানুষকে শেখায়— প্রকৃত সুখ হলো আখিরাতে মুক্তি, আর দুনিয়া তার প্রস্তুতিক্ষেত্র।

**৬. নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ**

ইসলামের পূর্বে নারীরা সমাজে উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু ইসলাম সুখ ও সফলতার ধারণায় নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান মর্যাদা দিয়েছে।

**“আমি কোনো কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী; তোমরা সবাই একে অপরের অংশ।”(সূরা আলে ইমরান 3:195)**এই সমতা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ব্যক্তি ও সামষ্টিক উভয় সুখের পথ সুগম করেছে।

**সারসংক্ষেপ**

ইসলাম আগমনের পর সুখের ধারণা হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চিরন্তন ভিত্তিক। এটি মানুষকে দুনিয়ার সাময়িক আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর স্মরণ, ন্যায়পরায়ণতা, কৃতজ্ঞতা ও আখিরাতমুখী জীবনের দিকে পরিচালিত করে।সুতরাং, ইসলামী দৃষ্টিকোণে সুখের মূল সূত্র হলো —"আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকৃত সুখ, আর তাঁর স্মরণেই আত্মার প্রশান্তি।"

৫.৩: রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের জীবন থেকে উদাহরণ

ইসলাম আগমনের পর সুখের ধারণার বাস্তব উদাহরণ আমরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাদের জীবনে। তাঁদের জীবন ছিল আত্মিক শান্তি, ধৈর্য, ত্যাগ, ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে গঠিত। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, প্রকৃত সুখ কোনো বাহ্যিক সম্পদ বা পদমর্যাদায় নয়; বরং অন্তরের প্রশান্তি, আল্লাহভীতি ও পরকালীন মুক্তির আশায় নিহিত।

**১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন: দুনিয়ার নয়, আখিরাতের সুখে মনোনিবেশ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়ায় অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন।তাঁর ঘরে কখনো কখনো কয়েক দিন ধরে চুলায় আগুন জ্বলত না। সাহাবিরা জানতে চাইলে তিনি বলতেন—**"আমাদের কাছে আজ শুধু পানি ও খেজুরই আছে।"(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৫৯)**

তবুও তাঁর মুখে কখনো অভিযোগ ছিল না; বরং সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন। তিনি দুনিয়াকে এক অতিথিশালা হিসেবে দেখেছেন, যেখানে মানুষ সাময়িকভাবে অবস্থান করছে। তিনি বলেছেন—

**"আমি এই দুনিয়ায় সেই পথিকের মতো, যে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নেয়, তারপর চলে যায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪১৬)**এই হাদীসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন—প্রকৃত সুখ দুনিয়ার প্রাচুর্যে নয়, বরং আখিরাতমুখী মনোভাবে।

**২. কষ্টের মধ্যেও সুখ—রাসূল ﷺ-এর ধৈর্য্য ও আল্লাহর প্রতি ভরসা**

তাঁর জীবনে ছিল অবিরাম কষ্ট, নির্যাতন, দারিদ্র্য ও ত্যাগ। তবুও তিনি বলতেন— "যদি আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে আমি অন্য কিছু চাই না।"এ কথার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন, সুখ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—**নিঃসন্দেহে প্রতিটি কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি!(সূরা ইনশিরাহ 94:6)**

এই আয়াতের শিক্ষা তিনি নিজ জীবনে ধারণ করে অন্যদেরও ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর আস্থা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

**৩. সাহাবাদের জীবন: পরিতৃপ্তি ও আখিরাতনির্ভর সুখ**

**হযরত আবু বকর (রা.)**

তিনি ছিলেন ধনবান ব্যবসায়ী, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সব সম্পদ ব্যয় করেন ইসলামের পথে। তবুও তাঁর অন্তর ছিল প্রশান্ত। তিনি বলতেন— **"যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, তার দুনিয়ার কষ্টও মধুর মনে হয়।"**এটাই ইসলামী সুখের মর্ম—আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আনন্দ।

**হযরত উমর (রা.)**

তিনি যখন খলিফা হন, তখন বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন; তবুও রাতে সাধারণ পোশাকে রাস্তায় ঘুরতেন দরিদ্রদের খোঁজ নিতে।তিনি বলতেন— "যদি একটি পশু পথের মধ্যে পড়ে যায়, আমি ভয় করি যে আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন কেন আমি তার খোঁজ

রাখিনি।"এই ভয় ও দায়িত্ববোধ তাঁকে সত্যিকারের শান্তি দিয়েছে।কারণ, ইসলাম শেখায়— সুখ শুধু নিজের নয়, অন্যের মঙ্গলেও নিহিত।

**হযরত বিলাল (রা.)**

ইসলাম গ্রহণের পর অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। গরম বালুর ওপর পাথর রাখা অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল শুধু একটি শব্দ— "আহাদ, আহাদ" (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ)।এই দৃঢ় ঈমানই তাঁকে কষ্টের মধ্যেও প্রশান্ত রেখেছিল।তাঁর সুখ ছিল স্বাধীনতার নয়, বরং আল্লাহর একত্বের স্বাদে।

**৪. দুনিয়াকে ত্যাগ নয়, নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার**

রাসূল ﷺ দুনিয়াকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে বলেননি; বরং শিখিয়েছেন, দুনিয়া হবে আখিরাতের প্রস্তুতিক্ষেত্র।তিনি বলেছেন— **"দুনিয়া তোমার জন্যে যেন এমন হয়, যেন তুমি পথিক।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪১৬)**

অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে প্রয়োজনমতো নাও, কিন্তু এতে আসক্ত হয়ো না।সাহাবারা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন, তবে তা পরিত্যাগ করেননি—তাঁরা দুনিয়া ব্যবহার করেছেন আখিরাতের সওগাত অর্জনের জন্য।

**৫. প্রকৃত সুখ: আখিরাতের সফলতা**

রাসূল ﷺ একবার বলেছেন—

**"যে ব্যক্তি সকালে নিরাপদ, দেহে সুস্থ এবং দিনের খাবার আছে, সে যেন পুরো দুনিয়া পেয়ে গেছে।" (তিরমিজি, হাদীস: ২৩৪৬)**

অর্থাৎ প্রকৃত সুখ মানে হলো নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সন্তুষ্টি।সাহাবারা এই সরল দৃষ্টিভঙ্গিই ধারণ করেছিলেন; তাদের সুখ ছিল আল্লাহর অনুগ্রহে, না যে দুনিয়ার প্রাচুর্যে।

**সারসংক্ষেপ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের জীবনে সুখের ধারণা ছিল আল্লাহভীতি, সন্তুষ্টি, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা এবং আখিরাতমুখী মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন —

- সুখ হলো আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যে।
- সুখ হলো ন্যায় ও দায়িত্বের পথে চলায়।
- সুখ হলো আখিরাতের মুক্তির আশায় বেঁচে থাকা।

অতএব, ইসলাম আগমনের পর সুখ আর সাময়িক আনন্দ নয়; বরং চিরন্তন প্রশান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নাম।

## ভূমিকা — সমস্যা ও পদ্ধতি

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সমাজে "সুখ" ধারণা কেবল ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি নয়; এটি ছিল আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এক সম্মিলিত ধারণা। ইতিহাসে দেখা যায়— কোরআনী-হাদীস ভিত্তিক তত্ত্ব ও দ্বায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান (ইসলামী আইন, ওয়াকফ, যাকাত), দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা (ফারাবি, ইবনে সিনা, গাজ্জালী, সুফি কিতাব) এবং বাস্তব সামাজিক নীতি (ঔপনিবেশিক-পরবর্তী পরিবর্তন, রাজতন্ত্র/খিলাফত/সালতানত) — সকলের সমন্বয়ে এই ধারণা বিকশিত হয়। নিচে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

## ১. মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তি — কোরআন, হাদীস ও শারিয়া

- **কোরআন ও হাদীসে সুখের উৎসকে আধ্যাত্মিক**—আল্লাহভীতি, সৎকর্ম, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে; ফলে সামাজিক ন্যায় ও দরিদ্রদের-সাহায্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (সূত্র: সূরা নাহল 16:97; সূরা রা'দ 13:28; হাদীসসমূহ)।
- **শারিয়া**—ব্যক্তির অধিকার-দায়িত্ব, সম্পত্তির বিধান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা—এসবই গ্রহণ করা হয় সুখ-সংরক্ষণের উপায় হিসেবে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত কল্যাণ কখনোই সমাজের ক্ষতির বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য নয়
- **ফল**: ধর্মীয় আদেশই ছিল ইতিহাসগতভাবে সুখ তৈরির নীতি—কিন্তু তা কার্যকর করতে প্রয়োজন ছিল প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা (যাকাত, ওয়াকফ, বিচার)।

## ২. প্রতিষ্ঠানগত বাস্তবতা — সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থাগুলি

ইতিহাসে মুসলিম সমাজে সুখ কেবল ব্যক্তিগত নৈতিকতা নয়; রাষ্ট্র ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করত— নিচে মূল কিছু ব্যবস্থা:

**যাকাত ও সাদাকা**: সরকারি/অর্ধ-সরকারিভাবে সংগৃহীত করে দরিদ্র, ভূমিহীন, পথভ্রষ্ট ও শিক্ষা/স্বাস্থ্যতেও ব্যয়। এটি দারিদ্রতা-হ্রাস করে সামাজিক প্রশান্তি নিশ্চিত করে।

**ওয়াকফ (বৈতনিক দান):** শিক্ষা, হাসপাতাল, পথ, সেতু, পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ— ওয়াকফ ছিলেন দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষার প্রধান হাতিয়ার; দরিদ্রদের স্থায়ী সুবিধা দেয়।

**বিমারিস্তান (রোগশালা) ও পাবলিক সার্ভিস:** মধ্যযুগী ইসলামী শহরগুলোতে বিনা-মূল্যে হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র ও জলব্যবস্থা ছিল — এগুলো মানবিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে সুখকে বাস্তবে রূপ দেয়।

**আইনি ব্যবস্থা ও বিচার:** কজিয়াহ্/শুরা-ভিত্তিক স্থানীয় সুবিচার; রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে দুর্নীতি ও অন্যায় দমন করার চেষ্টা সুখের পরিবেশ বজায় রাখে।

**ইতিহাস:** রাশিদুন-আব্বাসিদ-ওটোমান যুগে ওয়াকফ ও সরকারি দানশীলতা সমাজে স্থিতিশীলতা ও কল্যাণ বয়ে এনেছিল—ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের জীবনে স্থায়ী সেবার উপস্থিতি গ্রাস করে জীবনমান উন্নত করেছিল।

**৩. দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঃ "সুখ" কে কেমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে**

ইসলামী দর্শন ও সুফি ভাবধারায় ভিন্ন-ভিন্ন দিক থেকে সুখকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইবনে সিনা (অল-বীরুনী/ইবনে সিনা) মানসিক–রোগবিজ্ঞানীয় দিক: আত্মার সুস্থতা ও তত্ত্বীয় জ্ঞানের দাবি — জ্ঞান ও আত্মার পূর্ণতা, ফলে সুখ।

আল-গাজ্জালী ও সুফি-প্রথা: আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (maʿrifah, dhikr), ত্যাগ ও অন্তর্দীক্ষা-এগুলোকে সুখের মূল বলে দেখেন; 'আত্মার সমৃদ্ধি' সর্বোচ্চ। আল-গাজ্জালীর Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn-এ সুখ আসে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে।

মিলিতভাবে: ইসলামিক বুদ্ধিবৃত্তি ঐতিহাসিকভাবে দেখিয়েছে—সুখ এককভাবে বহিরাগত সুযোগ বা সুখসামগ্রী নয়; বরং নৈতিকতা + জ্ঞান + আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত অবস্থা।

**৪. নৈতিক অর্থনীতি ও সমাজনীতি: ধারনা ও অনুশীলন**

ইতিহাসে মুসলিম সমাজে অর্থনীতির নৈতিক কাঠামো সুখ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে কাজ করত:বাণিজ্যকে নৈতিক করা: হালাল ব্যবসা, প্রতারণা-বর্জন, ও সামাজিক দায়বদ্ধতা—এগুলো ব্যবসায়িক চর্চা ও ব্যক্তিগত প্রশান্তির বৃদ্ধি করে।

**রিজিক বিতরণ ও দরিদ্র-সংরক্ষণ:** ধনী-গরীবের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা (যাকাত, ওয়াকফ)।

**শহুরে পলিসি:** বাজার-নিয়ন্ত্রণ, ওজন-জত হিসাব, ভ্রান্ত মুনাফা দমন—এসবই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে স্থিতিশীল করে।

**ব্যবহারিক উপায়:** ঐতিহাসিক ব্যাঙ্ক/আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট ব্যবস্থা না থাকলেও, কনসেনসাস-বেসড অর্থনীতির নিয়ম—অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে সুখে অবদান রাখত।

**৫. পারিবারিক ও সামাজিক মানদণ্ড: আত্মিক-সামাজিক সুখ**

ইতিহাসে মুসলিম সমাজে পরিবারের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক— পারিবারিক বন্ধন, পিতৃহীন/অসহায়দের প্রতি কল্যাণ এবং সম্মান-সংস্কৃতি সুখের নিশ্চিত উপাদান ছিল। বিয়ের নৈতিকতা, সন্তান-শিক্ষা ও পরিবারিক দায়বদ্ধতার প্রতি জোর সামাজিক স্থিতি এনেছিল।

**৬. ধর্মীয়-আইনগত দিক: ন্যায়বিচার, অধিকার ও সুখের সম্পর্ক**

ইসলামী আইন (fiqh)-এ নিরাপত্তা, জীবিকার নিশ্চয়তা ও ন্যায়বিচারকে সুখের উৎস মনে করা হয়েছে। Maqasid al-Shariah (শারীয়াহ-এর উদ্দেশ্য)–এর আধুনিক ব্যাখ্যায়—সুখের রাষ্ট্রীয় এলাকাগুলো: জীবন রক্ষা, ধর্ম রক্ষা, বংশ রক্ষা, মেধা রক্ষা ও সম্পদ রক্ষা। রাষ্ট্র যদি এগুলো নিশ্চিত করে, নাগরিকরা সুখী হবে।

**৭. সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিফলন: সুখ-চিত্রকলা**

মধ্যযুগে কাব্য, সিয়ান (দেখা–দর্শন), সাধুসাহিত্যে সুখরূপকল্প দেখা যায়— ধ্যান, প্রেম (গাজ্জালির মোডে—ইশক-ইলাহী), নৈতিক সাহিত্য—এগুলো জনগণের মধ্যে সুখের ধারণাকে আভ্যন্তরীণ করে।

**৮. সুফি-চর্চা ও নৈতিক পুনর্গঠন**

সুফিজমের বিস্তার ব্যক্তিগত সুখকে গভীরতা দেয়—জিকির, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইশক-ইলাহী, মার্তাবায়ে নরমতা—এসব চর্চা মানুষের ভিতরে এমন প্রশান্তি জন্মায় যা নীতিগত ও সামাজিক অনুশাসনের বাইরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সুফি-আধ্যাত্মিকতার কারণে অনেক মুসলিম সমাজে ব্যক্তিগত শান্তি ও সামাজিক মেলবন্ধন গভীর হয়েছে।

**৯. ইতিহাস অনুযায়ী পরিবর্তন, পতন ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ**

ইতিহাসের এক পর্যায়ে (ঔপনিবেশিক অবস্থা, আধুনিকীকরণ, বাজারিকরণ) বহু ঐতিহ্যগত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়: ওয়াকফের অবক্ষয়, কল্যাণ-রাষ্ট্রের দুর্বলতা, নতুন বিনিয়োগমুখী আর্থিক পদ্ধতি—এসব দ্রুত পরিবর্তন মানুষের জীবন-নির্দেশকে প্রভাবিত করে এবং সুখ-ধারণার সংকট সৃষ্টি করে। আধুনিক সময়ে উপাদান-সুখ (material well-being) বেড়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক/সামাজিক শান্তি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত।

**১০. উপসংহার: ঐতিহাসিক ধারায় মুসলিম সমাজে সুখের সারমর্ম**

ইতিহাসে মুসলিম সমাজে সুখ ছিল—ইবাদতসম্মত ব্যক্তিগত প্রশান্তি + সামাজিক ন্যায় ও নিরাপত্তা + আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানচর্চার সম্মিলিত ফল। প্রতিষ্ঠান (যাকাত, ওয়াকফ), আইন (শারিয়া), দর্শন (ফারাবি/গাজ্জালি), এবং সরকারি নীতিই মিলিয়ে সময়ের সঙ্গে

পরিবর্তিত হলেও লক্ষ্যই ছিল: মানুষকে "স্থায়ী" নিরাপত্তা ও আত্মিক প্রশান্তি প্রদান করা। আধুনিক যুগে ঐসব ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির সমন্বয়ই সম্ভবত সুখ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক পথ।

### ৫.৫. ইতিহাসিক কেস-স্টাডি (সংক্ষিপ্ত): আব্বাসিদ/ওটোমান/মুঘল বাস্তবতা

**১. ওটোমান সাম্রাজ্য:** ওয়াকফ ব্যবস্থায় মসজিদ, শিক্ষালয়, হাসপাতাল ও দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থাপনা—নগরবাসীর কল্যাণে প্রভাব।

২. **আব্বাসিদ বাগদাদ:** বাগদাদ-এর হাসপাতাল, পাঠশালা, বীমারিস্টান— সামাজিক সেবার মাধ্যমে শহরে নিরাপত্তা ও জীবনমান বাড়ানো—সুখের বাস্তব অবদান।

**৩. মুঘল ভারত:** দরবার-ভিত্তিক কল্যাণ, সেচ-সেতু ও স্থাপত্য—কৃষি ও জনজীবনে স্থিতি এনে সুখের অবকাঠামো গড়ে তোলে।

এই কেস-স্টাডিগুলো দেখায়—ইনফ্রাস্ট্রাকচার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রার মানে প্রভাব ফেলে, ফলে সুখ বাড়ে।

### ❖ ওটোমান ওয়াকফ ব্যবস্থায় সুখ ও সমাজকল্যাণ (একটি কেস-স্টাডি)

ইসলামী ইতিহাসে সমাজকল্যাণ ও জনসেবার মাধ্যমে সুখ প্রতিষ্ঠার সর্বাধিক উজ্জ্বল উদাহরণগুলোর একটি হলো ওটোমান সাম্রাজ্যের ওয়াকফ (Waqf) ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত সুখ কেবল ব্যক্তিগত আরামে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, দান, সহমর্মিতা ও মানবসেবার মধ্যেই নিহিত।

#### ১. ওয়াকফের ধারণা ও ইসলামী ভিত্তি

"ওয়াকফ" (وقف) শব্দের অর্থ হলো — কোনো সম্পদকে স্থায়ীভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা, যাতে তা সমাজের উপকারে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— **"যখন মানুষ মারা যায়, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ব্যতীত— সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান), এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার পাওয়া যায়, এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬৩১)**

এই হাদীসের আলোকে ওটোমান শাসকেরা "ওয়াকফ" প্রথাকে এমনভাবে বিকশিত করেন, যাতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ কল্যাণ ভোগ করতে পারে।

#### ২. ওয়াকফ ব্যবস্থার সামাজিক প্রভাব

ওটোমান সাম্রাজ্যে (১৪শ–১৯শ শতাব্দী) ওয়াকফ শুধু মসজিদ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি ছিল এক বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের সুখ ও কল্যাণ নিশ্চিত করেছিল:

**শিক্ষা**

- ওয়াকফ তহবিল থেকে হাজার হাজার মাদ্রাসা ও স্কুল পরিচালিত হতো।
- শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বই, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো।
- আলেম, শিক্ষক ও গবেষকদের বেতনও ওয়াকফের মাধ্যমে দেওয়া হতো।

**স্বাস্থ্যসেবা**

- "দারুশ-শিফা" নামে পরিচিত হাসপাতালগুলো ওয়াকফ দ্বারা পরিচালিত হতো।
- রোগীদের চিকিৎসা, ওষুধ ও খাবার ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
- নারী চিকিৎসক ও ধাত্রীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, যা সে সময় ইউরোপে বিরল ছিল।

**জনকল্যাণ**

ওয়াকফ থেকে রাস্তা, সেতু, পানীয় জলের ফোয়ারা, অতিথিশালা (ইমারত), এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়।এমনকি পশুদের জন্যও পানির ব্যবস্থাসহ আলাদা ওয়াকফ ছিল।কেউ যদি বিদেশ থেকে এসে কষ্ট পায়, তার জন্যও ওয়াকফ থেকে থাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো।

**৩. অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার**

ওটোমান ওয়াকফ ব্যবস্থা সমাজে সম্পদ পুনর্বণ্টন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করত। ধনীরা তাদের সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করত, যা গরিবের কল্যাণে ব্যয় হতো।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

**"তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো (আল্লাহর পথে), তিনি তার পরিবর্তে তোমাদের তা প্রদান করবেন।" (সূরা সাবা, ৩৪:৩৯)**

এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে যায়, এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে।

**৪. নারী ও ওয়াকফ**

ওটোমান সাম্রাজ্যে নারীরা ওয়াকফ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। ইতিহাসে দেখা যায়, হাসেকি হুররাম সুলতান ওয়াকফ (Haseki Hürrem Sultan Waqf) নামে পরিচিত তহবিলের মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসার, হাসপাতালে নারী-চিকিৎসক নিয়োগ এবং দুঃস্থ মহিলাদের সহায়তা দেওয়া হতো।

এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারীকে সমাজে সুখ ও কল্যাণের কার্যকর অংশীদার হিসেবে মূল্যায়ন করেছে।

**৫. আধ্যাত্মিক সুখ ও সমাজকল্যাণের সম্পর্ক**

ওটোমান ওয়াকফ ব্যবস্থা শুধুমাত্র বস্তুগত সাহায্যই দেয়নি; বরং এটি মানুষের অন্তরে এক ধরণের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি সৃষ্টি করেছিল। কারণ ওয়াকফ প্রদানকারী জানত— তার সম্পদ দুনিয়ার বাইরে আখিরাতেও সওয়াব হিসেবে চলতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—**"মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী।" (আল-মুজাম আল-কবীর, হাদীস: ৫৮৯৩)**

অতএব, ওয়াকফ ছিল এমন এক ধারাবাহিক দান ব্যবস্থা যা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মনেই প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি এনে দিত।

**৬. সারসংক্ষেপ**

ওটোমান ওয়াকফ ব্যবস্থা ছিল ইসলামী সভ্যতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা প্রমাণ করে—

- প্রকৃত সুখ সমাজের কল্যাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
- দান, সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে মানুষ নিজের ভেতরে শান্তি খুঁজে পায়।
- এটি ইসলামী নীতির বাস্তব প্রয়োগ, যেখানে আধ্যাত্মিক সুখ ও সামাজিক উন্নয়ন একসঙ্গে গড়ে ওঠে।

ওয়াকফ তাই শুধু এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ছিল এমন এক মানবিক নৈতিক কাঠামো, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সুখের পথ উন্মুক্ত করেছে।

## ❖ আব্বাসিদ বাগদাদের হাসপাতাল ব্যবস্থা (বিমারিস্তান) — এক ঐতিহাসিক কেস-স্টাডি

### ভূমিকা

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে চিকিৎসা ও মানবকল্যাণের এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হলো বাগদাদের বিমারিস্তান (Bimaristan) বা হাসপাতাল ব্যবস্থা। এটি শুধুমাত্র চিকিৎসার কেন্দ্র ছিল না; বরং মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ নিশ্চিত করার একটি সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

আব্বাসিদ শাসনামলে (৮ম–১৩শ শতাব্দী) ইসলামি শিক্ষা ও বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা পশ্চিমা দুনিয়ায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

## ১. বিমারিস্তানের উৎপত্তি ও ইসলামী প্রেরণা

বিমারিস্তান শব্দটি এসেছে ফারসি "বিমার" (রোগী) ও "স্তান" (স্থান) শব্দ থেকে, অর্থাৎ রোগীদের আশ্রয়স্থল।ইসলামী সমাজে এর ধারণা আসে কুরআন ও হাদীস থেকে, যেখানে অসুস্থদের সেবা ও চিকিৎসা করাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"যে মুসলমান তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায়, সে যেন জান্নাতের বাগানে হাঁটছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৬৮)**

এই ভাবনা থেকেই মুসলমানরা চিকিৎসা ও সমাজকল্যাণকে একত্র করে মানুষের প্রকৃত সুখের উপায় হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

## ২. প্রথম বিমারিস্তান: আল-মানসুর ও হারুনুর রশীদের যুগ

প্রথম ইসলামী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় খলিফা আল-মানসুর (খিলাফতের রাজধানী: বাগদাদ) এর আমলে, আনুমানিক ৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।এরপর খলিফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬–৮০৯ খ্রি.) এবং তাঁর পুত্র আল-মামুন এই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করেন।

হাসপাতালগুলোতে শুধু মুসলমানই নয়, অমুসলিম রোগীরাও চিকিৎসা পেতেন।চিকিৎসক, নার্স ও ছাত্রদের জন্য আলাদা আবাসন ও বেতন দেওয়া হতো।দরিদ্র, অনাথ ও ভ্রমণকারীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।এই ব্যবস্থা ছিল ইসলামী দানশীলতা ও ন্যায়বিচারের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

## ৩. বিমারিস্তানের কাঠামো ও কার্যপ্রণালী

### (ক) চিকিৎসা বিভাগসমূহ:

বাগদাদের বিমারিস্তানে ছিল একাধিক বিভাগ—

- সার্জারি (শল্যচিকিৎসা)
- মেডিসিন (অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা)
- চক্ষু চিকিৎসা
- মানসিক চিকিৎসা (একটি বিশেষ ওয়ার্ড)
- নারী ও শিশু বিভাগ

### (খ) শিক্ষা ও গবেষণা:

বিমারিস্তান শুধু হাসপাতালই নয়, এটি ছিল এক বিশাল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।এখানে ছাত্ররা রোগীদের পর্যবেক্ষণ করত।প্রখ্যাত চিকিৎসকরা বক্তৃতা দিতেন, যেমন আর-রাজি (Rhazes) ও ইবনে সিনা (Avicenna)।ছাত্রদের পরীক্ষা ও লাইসেন্স দেওয়ার প্রথাও চালু ছিল, যা আধুনিক মেডিকেল ডিগ্রির পূর্বসূরী।

**(গ) ওষুধ ও ফার্মেসি:**

প্রতিটি হাসপাতালে নিজস্ব ফার্মেসি (Bayt al-Dawa) ছিল, যেখানে ওষুধ প্রস্তুত ও বিতরণ করা হতো। ওষুধ বিনামূল্যে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, এবং তার খরচ বহন করত ওয়াকফ ফান্ড।

**৪. বিমারিস্তান ও সামাজিক সুখ**

আব্বাসিদ হাসপাতাল ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, ইসলাম সুখকে শুধু আধ্যাত্মিক প্রশান্তি হিসেবে দেখেনি, বরং সমাজের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের সমন্বয় হিসেবেও বিবেচনা করেছে।রোগীর যত্ন নেওয়া হতো ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে।চিকিৎসক ও নার্সদের শিক্ষা দেওয়া হতো, "রোগীর শরীর নয়, তার মনকেও সুস্থ করতে হবে।"দরিদ্র বা অচেনা রোগীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, স্নানঘর ও পরিচ্ছন্ন পোশাকের ব্যবস্থা ছিল।

এভাবে চিকিৎসা ছিল একপ্রকার ইবাদত, যার মাধ্যমে চিকিৎসক ও দাতা উভয়েই আখিরাতের সওয়াব ও দুনিয়ার সুখ লাভ করতেন।

**৫. ইসলাম ও মানবকল্যাণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি**

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

**"যে কেউ একটি প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করল।" (সূরা মায়িদা ৫:৩২)**

এই আয়াতের চেতনায় গড়ে ওঠা বিমারিস্তানগুলো ছিল ইসলামী সভ্যতার মূলনীতি — জীবন রক্ষা, জ্ঞানচর্চা, এবং সেবা।এগুলো শুধু মুসলিম সমাজ নয়, ইউরোপের পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন — প্যারিস, কর্ডোভা ও রোমের হাসপাতালগুলোর আদর্শও হয়ে দাঁড়ায়।

**৬. আধ্যাত্মিক সুখ ও বিমারিস্তান**

চিকিৎসক ও দাতা উভয়ের মনেই একটি অভিন্ন তৃপ্তি ছিল —তারা জানত, প্রতিটি সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হচ্ছে।এই চেতনা থেকেই আব্বাসিদ চিকিৎসা ব্যবস্থা শুধু বিজ্ঞান নয়, বরং মানবিকতা ও ইমানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"যে মানুষ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭৩৭৬)**

**৭. উপসংহার**

আব্বাসিদ যুগের বিমারিস্তান ছিল ইসলামি সভ্যতার এক উজ্জ্বল প্রতীক, যা দেখিয়েছে—

- সুখ মানে শুধু সম্পদ নয়, বরং মানুষের দুঃখ দূর করার আনন্দ।
- চিকিৎসা মানে কেবল পেশা নয়, বরং আল্লাহর পথে সেবা।
- সামাজিক সুখ তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন জ্ঞান, দান ও দয়া একইসাথে কাজ করে।

এই ঐতিহাসিক উদাহরণ প্রমাণ করে যে, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গঠিত সমাজে প্রকৃত সুখ নিহিত থাকে সহানুভূতি, ন্যায়, ও সেবার মধ্যেই।

❖ **তুলনামূলক সারাংশ: ওয়াকফ বনাম বিমারিস্তান — ইসলামী সমাজকল্যাণের দুই রূপ**

**ভূমিকা :**

ইসলামী সভ্যতা সুখ ও কল্যাণকে কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব ও মানবসেবার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছে। আব্বাসীয় যুগের বিমারিস্তান (হাসপাতাল ব্যবস্থা) এবং ওসমানীয় যুগের ওয়াকফ (সামাজিক দান ও জনকল্যাণমূলক তহবিল) — উভয়ই ইসলামী সমাজকল্যাণ দর্শনের দুটি অনন্য রূপ। এই অংশে দেখা যাবে, কিভাবে এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইসলামি সুখ-দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

**১. প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও মূল দর্শন**

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে "বিমারিস্তান" (হাসপাতাল ব্যবস্থা) এবং "ওয়াকফ" (দানভিত্তিক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান) — এই দুটি প্রতিষ্ঠান এমন দুটি দৃষ্টান্ত, যা ইসলামি সমাজকল্যাণ ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। উভয়ের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের কল্যাণ, কিন্তু তাদের কাজের ক্ষেত্র ও দর্শন কিছুটা পৃথক ছিল।

বিমারিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত অসুস্থ, দরিদ্র ও সমাজের অসহায় মানুষদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য মহান আল্লাহর এক মহান আমানত। তাই চিকিৎসা ও মানবসেবা ছিল কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং ইবাদতের অংশ। এই প্রতিষ্ঠানগুলোয় চিকিৎসা বিনামূল্যে দেওয়া হতো, রোগী মুসলিম বা অমুসলিম—তা দেখা হতো না। চিকিৎসক, ওষুধ, গবেষণাগার এবং পাঠশালা সব একত্রে গড়ে উঠেছিল বিমারিস্তানের ভেতরেই, যা আজকের আধুনিক হাসপাতালের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচিত।

অন্যদিকে, ওয়াকফ ব্যবস্থা ছিল এক বিস্তৃত জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে স্থায়ী সুখ ও ভারসাম্য স্থাপন করা। কেউ নিজের সম্পদ, জমি, আয় বা ভবন জনকল্যাণের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান করত—যাকে বলা হয় "সদকা জারিয়া" বা চিরস্থায়ী দান। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

**“তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তা আল্লাহ ভালোভাবে জানেন।”— (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৩)**
এই ধারণা থেকেই ওয়াকফ ব্যবস্থার উদ্ভব, যেখানে স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ, পানির কূপ, রাস্তা, হাসপাতাল ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হতো। এর উদ্দেশ্য কেবল দান নয়, বরং দানকে চিরস্থায়ী করে সমাজে সুখের স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা।
দুটি প্রতিষ্ঠানই একই বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত—“মানবসেবা মানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি”। তবে বিমারিস্তান যেখানে মানবজীবনের শারীরিক সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছে, সেখানে ওয়াকফ ব্যবস্থার দৃষ্টি ছিল সমাজের সার্বিক কল্যাণে—শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তা পর্যন্ত। এভাবেই ইসলামী সভ্যতায় সুখের ধারণা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে একটি সমষ্টিগত, সেবামূলক ও আধ্যাত্মিক দর্শনে রূপ নিয়েছে।

## ২. সামাজিক প্রভাব ও ক্ষেত্রভিত্তিক পার্থক্য

বিমারিস্তান: জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গবেষণা, ও শিক্ষা—এই চার ক্ষেত্রকে একত্র করেছে।
ওয়াকফ: সমাজের প্রায় সব দিককে ছুঁয়েছে—স্কুল, মাদরাসা, পানির কূপ, রাস্তা, এতিমখানা, লাইব্রেরি, মসজিদ ইত্যাদি।
উভয়ের লক্ষ্য একই: সমাজের প্রতিটি স্তরে সুখের সমান বণ্টন।

## ৩. ইসলামী সুখ-দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ

বিমারিস্তান ও ওয়াকফ উভয়ই “সুখ” (সা‘আদাহ)-এর তিন স্তরকে সমন্বিত করেছে—

- শারীরিক সুখ: স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা
- মানসিক সুখ: সহানুভূতি, সম্মান ও সামাজিক স্বীকৃতি
- আধ্যাত্মিক সুখ: দান, সেবা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

## ৪. দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

বিমারিস্তান আধুনিক হাসপাতাল ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে।ওয়াকফ আধুনিক “ট্রাস্ট” ও “চ্যারিটি ফাউন্ডেশন”-এর প্রেরণা দিয়েছে।উভয় ব্যবস্থাই মুসলিম সমাজে সুখের ধারণাকে “সমষ্টিগত” রূপে গড়ে তুলেছে — যেখানে সমাজের এক জনের কল্যাণ মানেই সবার কল্যাণ।

## ৫. তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিমারিস্তান ও ওয়াকফ — এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইসলামী সমাজকল্যাণের দুই ভিন্ন কিন্তু পরিপূরক রূপ। উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সমাজে প্রকৃত সুখ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

গড়ে উঠেছিল। তবে তাদের কাঠামো, কাজের ধরন এবং প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল আলাদা, যা ইসলামী সভ্যতার বহুমাত্রিক সামাজিক দর্শনকে ফুটিয়ে তোলে।

বিমারিস্তান উদ্ভূত হয় মূলত আব্বাসীয় যুগে (৮ম–১০ম শতাব্দী), যখন চিকিৎসা ও বিজ্ঞান চর্চা ইসলামী জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এখানে প্রধানত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া হতো। এটি এমন এক দৃষ্টান্ত, যেখানে "সুখ"কে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। রোগীর পরিচয় বা ধর্ম নির্বিশেষে, সবাইকে সেবার আওতায় আনা হয়—যা ইসলামের সর্বজনীন মানবিকতার বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে, ওয়াকফ ব্যবস্থা বিকশিত হয় বিশেষভাবে ওসমানীয় যুগে (১৪শ–১৯শ শতাব্দী), এবং এর ক্ষেত্র ছিল আরও বিস্তৃত। ওয়াকফের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, অবকাঠামো ও জনসেবার সমন্বিত কাঠামো গড়ে ওঠে। এটি এমন এক ব্যবস্থা, যা সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং সুখকে কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

এই তুলনায় দেখা যায়, বিমারিস্তান ছিল শরীর ও মনের সুখের প্রতীক, আর ওয়াকফ ছিল সমাজ ও আত্মার সুখের প্রতিফলন। বিমারিস্তান সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন—চিকিৎসা ও সেবা—মেটাত, আর ওয়াকফ দীর্ঘমেয়াদে সমাজের স্থায়ী উন্নয়নের পথ রচনা করত।

দুটির মিলিত রূপে ইসলাম যে সুখের ধারণা উপস্থাপন করেছে, তা আধুনিক সমাজকল্যাণ তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে যায়। এখানে সুখ মানে ভোগ নয়, বরং দায়িত্ব, সহমর্মিতা, ন্যায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এই ভারসাম্যই ইসলামী সমাজকে অন্য সভ্যতা থেকে আলাদা করেছে এবং ইতিহাসে এক অনন্য সুখ-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

## ৬. উপসংহার

ইসলামী সভ্যতায় সুখের ধারণা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না—বরং ছিল সমষ্টিগত ও সেবামূলক। বিমারিস্তান মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুখ নিশ্চিত করেছে, আর ওয়াকফ সমাজের স্থায়ী আর্থিক ও আধ্যাত্মিক সুখের ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

উভয়ের মিলিত রূপে গড়ে ওঠে এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে সুখ শুধুমাত্র উপভোগ নয়, বরং মানবসেবা, ন্যায়বিচার ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সমন্বিত ফল।

# অধ্যায় ৬: আধুনিক যুগে সুখের ধারণা ও ইসলামের সমাধান

## ৬.১ আধুনিক সমাজে সুখ -অর্থ, খ্যাতি, ভোগবিলাস

আধুনিক যুগে "সুখ" ধারণাটি মূলত বস্তুবাদী চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ভোগবাদী অর্থনীতি, এবং গণমাধ্যমের প্রভাব মানুষকে এমন এক মানসিক কাঠামো তৈরি করেছে যেখানে সুখকে মাপা হয় সম্পদ, খ্যাতি ও আরাম-আয়েশের পরিমাণ দিয়ে। নিচে এই ধারণার মূল দিকগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

### ১. ভোগবাদী সুখের ধারণা

আধুনিক সমাজে সুখকে মূলত "ভোগের আনন্দ" বা material pleasure হিসেবে দেখা হয়।মানুষ মনে করে, যত বেশি জিনিসপত্র, বিলাসদ্রব্য ও প্রযুক্তিগত সুবিধা অর্জন করা যাবে, তত বেশি সুখী হওয়া যাবে।বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া এই ধারণাকে আরও গভীর করে তোলে—যেখানে সুখ মানে নতুন গাড়ি, দামি পোশাক, বা বিলাসবহুল জীবনযাপন।কিন্তু বাস্তবে এই ভোগবিলাস অস্থায়ী তৃপ্তি দেয়; তা দ্রুত মিলিয়ে যায়, ফলে আবার নতুন কিছুর আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়।

### ২. অর্থ ও সম্পদের মোহ

আজকের মানুষ বিশ্বাস করে—"টাকা থাকলেই সব পাওয়া যায়।"অর্থকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে দেখা হয়, যার মাধ্যমে সাফল্য ও সামাজিক মর্যাদা অর্জিত হয়।কর্মজীবনে প্রতিযোগিতা, সময়ের অভাব, এবং লোভ মানুষকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তোলে।কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে, সম্পদ নিজে খারাপ নয়—বরং এটি পরীক্ষা (fitnah)। আল্লাহ বলেন:

**"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।" (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৫)**

### ৩. খ্যাতির পেছনে দৌড়

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে "খ্যাতি" নতুন এক মানসিক আসক্তি।মানুষ এখন "কে আমাকে দেখছে", "আমার কতজন অনুসারী আছে"—এসবের মাধ্যমে আত্মমূল্যায়ন করে।এই খ্যাতির লালসা অনেক সময় আত্মতুষ্টি নষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে ঈর্ষা, হিংসা ও মানসিক উদ্বেগে ফেলে।

ইসলামী শিক্ষা এর বিপরীতে বিনয় (tawāduʿ) ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে আসল মর্যাদা হিসেবে তুলে ধরে।

### ৪. আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও একাকীত্ব

ভোগবাদ মানুষকে "আমি"-কেন্দ্রিক করে তোলে।ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে সমাজ, পরিবার ও মানবিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে।এর ফলে একাকীত্ব, বিষণ্নতা ও মানসিক শূন্যতা বাড়ছে—যা আধুনিক যুগের "নীরব মহামারি" হিসেবে চিহ্নিত।

অথচ ইসলামে সুখ আসে সমাজ, পরিবার ও উম্মাহর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে।

### ৫. সুখের ভ্রান্ত পরিমাপ

আধুনিক মানুষ সুখ মাপে বাহ্যিক মানদণ্ডে—যেমন পেশাগত সাফল্য, ব্যাংক ব্যালান্স, বাহ্যিক সৌন্দর্য। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো—

**"সুখ অন্তরের প্রশান্তিতে, যা আল্লাহর স্মরণে আসে।"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়।" (সূরা রা'দ, ১৩:২৮)**

### সারসংক্ষেপ

আধুনিক সভ্যতা সুখকে বাহ্যিক ভোগ ও সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে, কিন্তু এতে মানুষ হারিয়েছে আত্মার শান্তি ও জীবনের উদ্দেশ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে, প্রকৃত সুখ আসে আন্তরিক তৃপ্তি (কানাআত), আল্লাহর সন্তুষ্টি, এবং নৈতিক জীবনের ভারসাম্য থেকে।

৬.২ আধুনিক সমস্যাবলি — মানসিক চাপ, একাকীত্ব, বিষণ্নতা

### ভূমিকা

আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের সঙ্গে মানবজীবনে কিছু নতুন রোগবালাই — বিশেষত মানসিক চাপ (stress), একাকীত্ব (loneliness) ও বিষণ্নতা (depression) — ব্যাপকভাবে বাড়েছে। এগুলো কেবল ব্যক্তিগত কষ্ট নয়; পরিবার, কর্মক্ষেত্র, অর্থনীতি ও সার্বিক সামাজিক সুস্থতায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। নিচে প্রতিটি সমস্যার কারণ, লক্ষণ, ফলপ্রসূ প্রভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

### ১. মানসিক চাপ (Stress)

**সংজ্ঞা ও প্রকৃতি:** মানসিক চাপ হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার পরিবেশগত দাবী ও নিজের প্রতিকারের ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা অনুভব করে। আধুনিক জীবনে এটি ক্রমাগত, চক্রাকারে ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে—যা কর্মস্থান, পরিবার, আর্থিক চাপ, ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রত্যাশা থেকে উৎপন্ন হয়।

### প্রধান কারণসমূহ

**কর্মসংস্কৃতি ও কর্মব্যস্ততা:** দীর্ঘ কাজের সময়, অনিশ্চিত কাজ, অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা।
**আর্থিক উদ্বেগ:** ঋণ, জীবিকা নিশ্চিতকরণে অনিশ্চয়তা।

**তথ্যবহুল পরিবেশ:** ২৪/৭ সংবাদ, ইমেইল ও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বিরামহীন উদ্দীপনা।

**পারিবারিক চাপ:** একক পিতা-মাতা, কাজ ও গৃহজীবনের দ্বৈত দায়িত্ব।

**পরিবেশগত অস্থিরতা:** শহুরে জীবন, ভাড়া, দূষণ ইত্যাদি।

***প্রকাশ ও লক্ষণ***

**শারীরিক:** মাথাব্যথা, অনিদ্রা, পেটের অস্বস্তি, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি।

**মানসিক:** উদ্বেগ, ক্রমশ একাগ্রতার অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা।

**আচরণগত:** উত্তেজক আচরণ, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, কাজের উৎপাদনশীলতা হ্রাস।

**দূরগামী প্রভাব**

দীর্ঘমেয়াদী চাপ শারীরিক রোগ (হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ), মানসিক ব্যাধি (anxiety disorder, depression)

**২. একাকীত্ব (Loneliness)**

**সংজ্ঞা ও প্রকৃতি**

একাকীত্ব মানে কেবল শারীরিকভাবে একা থাকা নয়; বরং সামাজিক সংযোগের অভাব—অর্থাৎ লোকের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক নেই বলে যে অভাব লাগে। আধুনিক সমাজে পরিবারের হ্রাস, পারিবারিক ভাঙন, প্রযুক্তি-নির্ভর সম্পর্কগুলো একাকীত্ব বাড়িয়েছে।

**মূল কারণসমূহ**

**নগরায়ন ও স্থানান্তর:** কর্মসূত্রে পরিবার থেকে দূরে গিয়ে বসবাস।

**পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন:** ছোট পারিবারিক ইউনিট, যৌথ পরিবারের অবক্ষয়।

**সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকায় বদল:** সংখ্যায় 'বন্ধু' বেড়েছে, কিন্তু মানে সম্পর্ক দুর্বল—superficial connection।

**জীবনশৈলীর ব্যস্ততা:** কাজের চাপ ও সময়ের অভাবে সম্পর্ক নির্মাণে ব্যর্থতা।

**প্রকাশ ও লক্ষণ**

**আবেগগত:** নিঃসঙ্গতা, মূল্যহীনতার বোধ, আত্মসম্মানহানি।

**আচরণগত:** সামাজিক অনুষ্ঠানে না যাওয়া, কথাবার্তার এড়ানো।

**শারীরিক:** ঘুমের ব্যাঘাত, খাওয়ার সমস্যা, রোগপ্রবণতা বাড়া।

**দূরগামী প্রভাব**

দীর্ঘমেয়াদি একাকীত্ব হৃদরোগ-সহ শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায়, ডিপ্রেশন ও আত্মহত্যার মত হাই-রিস্ক অবস্থা তৈরি করে। সামাজিক স্তরে এটি সমাজবিচ্ছিন্নতা ও কম সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার সৃষ্টি করে।

### ৩. বিষণ্ণতা (Depression)

#### সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বিষণ্ণতা হলো মেজাজের একটি ক্লিনিক্যাল অবস্থা—দীর্ঘকালীন দুঃখ, উদাসীনতা, আগ্রহহীনতা এবং কার্যক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ নিয়ে থাকে। এটি কালের পরিক্রমায় হাল্কা দুঃখ থেকে মারাত্মক মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিতে পারে।

#### উৎপত্তি/কারণসমূহ (Multifactorial)

**জৈবিক কারণ**: জিনেটিক প্রপেনসিটি, নিউরোট্রান্সমিটার ইমব্যালান্স।

**মনস্তাত্ত্বিক কারণ**: দীর্ঘ-অবহেলিত মানসিক চাপ, ট্রমা, এবং নেতিবাচক চিন্তাধারা (negative cognitive patterns)।

**সামাজিক কারণ:** একাকীত্ব, সম্পর্কহীনতা, আর্থিক সংকট।

**জীবন-বৃত্তীয় ঘটনা:** স্নায়ুবিক ঘটনা যেমন মৃত্যুঘটনা, বিচ্ছেদ, চাকরিচ্যুতি।

#### লক্ষণসমূহ

- দীর্ঘস্থায়ী মলিনতা, আশা-নিরাশা, বিচারশক্তি কমে যাওয়া।
- আগ্রহ-হ্রাস (hobby/interest loss), শক্তিহীনতা, ঘুম বা ক্ষুধা পরিবর্তন।
- আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি

#### প্রভাব ও ব্যপ্তি

বিষণ্ণতা কাজের উৎপাদনশীলতা কমায়, পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং অর্থনীতিতে (loss of productivity, healthcare costs) বড় প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা না পেলে ক্রমশ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

### ৪. আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাগুলোর আন্তঃসংযোগ

মানুষের ওপর চাপ, একাকীত্ব ও বিষণ্ণতা আলাদা আলাদা সমস্যা মনে হলেও বাস্তবে এগুলো গভীরভাবে আন্তঃসংযুক্ত। উদাহরণ—অধিক কাজের চাপ মানুষকে সামাজিক মেলামেশা থেকে বিরত রাখে → একাকীত্ব বাড়ে → একাকীত্ব ডিপ্রেশন-এ রূপ নেয়। আবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলনা-মানসিকতা (upward social comparison) আত্মসম্মান হ্রাস করে, যা anxiety/depression-কে ত্বরান্বিত করে।

### ৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

**সমাজিক মাত্রা:** পারিবারিক ভাঙন, অপরাধ বৃদ্ধি, সামাজিক অস্থিরতা ও কম সামাজিক সম্প্রীতি।

**অর্থনৈতিক মাত্রা:** কর্মক্ষমতা-ক্ষতি, অসুস্থতার ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি (absenteeism) ও বার্ণআউট।

**সার্বিক সুস্থতা:** জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে—শরীরিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক রোগও বাড়ে, স্বাস্থ্যসেবা-চাহিদা তুঙ্গে ওঠে।

**৬. ঝুঁকি–নির্ণায়ক ফ্যাক্টর ও প্রজনন (Vulnerabilities & Propensities)**

**যুবক ও তরুণ প্রজন্ম:** চাকরি-উপলব্ধি, সমাজিক চাপ, শিক্ষা-প্রতিযোগিতায় উচ্চ ঝুঁকি।

**বৃদ্ধবৃন্দ:** একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ।

**শহরবক্ত:** উচ্চ জীবন-ব্যয়, ভাড়া, বিচ্ছিন্ন পরিবার—মানসিক চাপ বেশি।

**কম আয়ের জনগোষ্ঠী:** আর্থিক অনিশ্চয়তা মানসিক অসুস্থতা বাড়ায়।

**৭. বাধা: আধুনিক সমাজে সাহায্যগ্রহণের সমস্যা**

**স্টিগমা ও লজ্জা:** মানসিক সমস্যা নিয়ে সামাজিক কলঙ্ক থাকায় সাহায্য নেওয়া কম।

**সেবা-অপলব্ধতা:** মানসম্মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নগর-গ্রামভেদে অসমভাবে প্রাপ্য।

**ধর্মীয় কুসংস্কার:** কখনো মানসিক সমস্যাকে কেবল আধ্যাত্মিক পরীক্ষাই বলে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়—যা চিকিৎসার বিলম্ব ঘটায়।

**আর্থিক-বাধা:** চিকিৎসা খরচ বহনযোগ্য না হলে সেবা না নেওয়া।

**উপসংহার**

আধুনিক যুগে মানসিক চাপ, একাকীত্ব ও বিষণ্নতা কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত দুর্ভোগ নয়; এগুলো সামাজিক ও জাতিগত স্বাস্থ্য-চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। কারণসমূহ জটিল ও বহুমাত্রিক—শ্রমসংস্কৃতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, পরিবার কাঠামো ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এসবের মিশেলে এগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শুধু চিকিৎসা নয়—ব্যাপক সামাজিক নীতি, শিক্ষা, কর্মসংস্কৃতি-পরিবর্তন, এবং ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক সংবেদনশীল সমাধান একসাথে প্রয়োগ না হলে এই সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান পাওয়া কঠিন হবে।

### ৬.৩ ইসলামের সমাধান ⟶ আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, দয়া ও ভ্রাতৃত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ

**ভূমিকা**

আধুনিক সভ্যতা মানুষের বস্তুগত উন্নয়ন ঘটালেও, তার অন্তরের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। অর্থ, খ্যাতি ও প্রযুক্তি মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, কিন্তু হৃদয়ের প্রশান্তি দিতে পারেনি।

এই অবস্থায় ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে, যেখানে বস্তু ও আত্মা, দেহ ও মন, ইহকাল ও পরকাল — সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুখ শুধুমাত্র বাহ্যিক সাফল্য নয়, বরং এটি অন্তরের প্রশান্তি (সাকিনা), আল্লাহর সন্তুষ্টি, এবং সমাজে কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সমন্বয়। নিচে আধুনিক জীবনের মানসিক ও সামাজিক সমস্যার প্রতিকার হিসেবে ইসলামের তিনটি প্রধান সমাধান তুলে ধরা হলো।

## ১. আধ্যাত্মিক প্রশান্তি (Spiritual Peace / Sukoon)

### (ক) আল্লাহর স্মরণ (যিকর)

কুরআনে আল্লাহ বলেন—**"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি পায়।"(সূরা রা'দ ১৩:২৮)** মানুষের আত্মা আল্লাহর প্রতি সংযুক্ত না হলে কখনো তৃপ্ত হয় না। বস্তুগত ভোগে সাময়িক সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী প্রশান্তি আসে যিকর, দোয়া, সালাত ও তাওবার মাধ্যমে। এই আধ্যাত্মিক সংযোগ মানুষকে হতাশা ও একাকীত্ব থেকে রক্ষা করে।

### (খ) নামাজের ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন—**"সালাতে আমার চোখের প্রশান্তি রেখেছেন আল্লাহ।"(সহীহ নাসাঈ, হাদীস: ৩৯৪০)**নামাজ মানসিক শান্তির প্রাকৃতিক থেরাপি। এতে ব্যক্তি নিজের সমস্যাগুলো আল্লাহর কাছে তুলে ধরে, আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখে, নিয়মিত সময়ের শৃঙ্খলায় জীবন গড়ে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যাকে mindfulness বলে, ইসলামে সেটাই সালাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

### (গ) তাওয়াক্কুল ও কদরের বিশ্বাস

মানুষ যখন জানে যে সমস্ত কিছু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়, তখন উদ্বেগ হ্রাস পায়।

**"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"(সূরা আত-তালাক ৬৫:৩)**

এই বিশ্বাস মানুষকে স্থির করে তোলে, জীবনের ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করতে শেখায়।

## ২. দয়া ও ভ্রাতৃত্ব (Compassion and Brotherhood)

### (ক) মানবসম্পর্কে মমতা

ইসলাম শুধু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক নয়, বরং মানুষে-মানুষে সম্পর্ককেও গুরুত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“তোমরা একে অপরকে ভালোবাসা না পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৫৪)**ই

কুরআনে বলা হয়েছে—

**“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে যেন এমন এক বীজ বপন করে যা সাতটি শীষে বৃদ্ধি পায়...”(সূরা বাকারা ২:২৬১)**

দান (যাকাত, সদকা, ওয়াকফ) মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। এটি সমাজে সম্প্রীতি আনে, হিংসা কমায় এবং সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এতে দাতা পায় আত্মতৃপ্তি ও অন্তরের সুখ—যা কেবল ভোগে পাওয়া যায় না।

**(গ) উম্মাহ বা ভ্রাতৃত্ববোধ**

ইসলাম শিখায় যে সব মুসলমান এক দেহের অঙ্গের মতো।

**“যদি দেহের একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, সমগ্র দেহই অশান্ত হয়।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৬)**

এই পারস্পরিক সহমর্মিতা ও একাত্মতা একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করে। আধুনিক সমাজে যে ‘social isolation’ বেড়েছে, ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভ্রাতৃত্ববোধ তা নিরাময় করে।

**৩. নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Values and Inner Discipline)**

**(ক) নৈতিক চরিত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**“আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।”(মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ১৬১৪)**

নৈতিকতা মানুষের মনকে পবিত্র রাখে। অসততা, প্রতারণা, হিংসা ইত্যাদি অভ্যাস আত্মাকে অস্থির করে তোলে, আর সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতা হৃদয়ে প্রশান্তি আনে। আধুনিক সমাজে যখন নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে, ইসলাম ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত নৈতিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রকৃত মানসিক স্থিরতা দেয়।

**(খ) আত্মসংযম ও সাবর**

ইসলামে সবর (ধৈর্য) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা) হলো সুখের দুই স্তম্ভ।**“অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সীমাহীন প্রতিদান রয়েছে।”(সূরা যুমার ৩৯:১০)**

মানুষ যখন বিপদে ধৈর্য ধরে ও সুখে কৃতজ্ঞ থাকে, তখন জীবনের ওঠানামায় ভারসাম্য বজায় থাকে। এতে উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমে যায়।

**(গ) জীবনদর্শনের ভারসাম্য**

ইসলাম শেখায়—**"তুমি এই দুনিয়ায় এমনভাবে বাস করো যেন তুমি আগামীকালই পরকাল পাবে; আবার এমনভাবেও কাজ করো যেন তুমি আজই জীবিকা অর্জন করবে।"(ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪১৭৭)**

এই ভারসাম্যই ইসলামের বিশেষত্ব—যেখানে আখিরাতের চিন্তা দুনিয়ার দায়িত্বকে অস্বীকার করে না। ফলে মানুষ কাজ করে আত্মতৃপ্তি পায়, অথচ ভোগবাদে হারিয়ে যায় না।

**উপসংহার**

আধুনিক যুগের মানসিক ও সামাজিক সংকটের মুখে ইসলাম দেয় একটি সমন্বিত জীবনদর্শন —যেখানে সুখের উৎস হলো আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ, মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি, এবং নৈতিকভাবে সৎ জীবনযাপন।এই তিনটি স্তম্ভ—

**১। আধ্যাত্মিক প্রশান্তি,**

**২।ভ্রাতৃত্ব ও মমতা,**

**৩। নৈতিক দৃঢ়তা—**

একত্রে মানুষকে দেয় দেহ-মন-আত্মার পূর্ণ প্রশান্তি, যা কোনো বস্তুগত উন্নতিতে পাওয়া সম্ভব নয়।

৬.৪ মনোবিজ্ঞান বনাম ইসলামী শিক্ষা — একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

**ভূমিকা**

আধুনিক মনোবিজ্ঞান (psychology) আর ইসলামী শিক্ষার উভয়ই উদ্দেশ্য মানুষের সুখ, মানসিক সুস্থতা ও কল্যাণ—তবে প্রত্যেকটি বিভিন্ন সূত্র, পদ্ধতি ও মাপকাঠি থেকে এগোয়। মনোবিজ্ঞান প্রধানত বিজ্ঞানভিত্তিক উপাত্ত, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর নির্ভর করে; আর ইসলামী শিক্ষা কোরআন–হাদিস ও ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আচরণ ও অন্তরের পথে নির্দেশ দেয়। নিচে এই দুই ধারার মিল, অমিল, সংঘাত ও সমন্বয়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো ব্যাখ্যা করা হলো।

**১) মূল তত্ত্বগত নির্দশন (Theoretical foundations)**

**মনোবিজ্ঞান:**

সুখ ও কল্যাণ নিয়ে আধুনিক গবেষণায় দুটি প্রধান প্রবাহ দেখা যায়—hedonic well-being (সুখ, আনন্দ, আরাম) এবং eudaimonic well-being (অর্থপূর্ণ জীবন, আত্মসত্তার বিকাশ)।

পজিটিভ সাইকোলজি (Seligman ইত্যাদি) সুখকে ৫টি উপাদানে ভাগ করে: আনন্দ, প্রবৃত্তি/বিভক্ততা , অর্থ , সম্পর্ক , অর্জন — যার সংক্ষেপ হলো PERMA মডেল।মানসিক অসুস্থতা ও চাপ মোকাবিলায় CBT, মাইন্ডফুলনেস-বেসড থেরাপি ইত্যাদি কার্যকর পন্থা।

**ইসলামী শিক্ষা:**

সুখ নির্ধারণ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, আত্মশুদ্ধি (তাসকিয়া), তাকওয়া, ইবাদত ও সমাজকল্যাণের মাধ্যমে — অর্থাৎ সুখ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে দেখা হয়।নিয়ামত, ধৈর্য (সবর), কৃতজ্ঞতা (শুকর), কানাআত (contentment) ইত্যাদি গুণ শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি: দুনিয়ার সুখ সাময়িক; স্থায়ী সুখ আখিরাতে।

## ২) মিল (Points of convergence)

★ **অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি ও মানসিক স্বাস্থ্য:**

মনোবিজ্ঞান বলছে—মাইন্ডফুলনেস, কৃতজ্ঞতা অনুশীলন, সম্পর্ক উন্নয়ন মানসিক চাপ কমায় ও সুখ বাড়ায়। ইসলামী ঐতিহ্যে এই অনুশীলনগুলো (জিকির/দোয়া, শুকর, সালাত, সৎ সঙ্গ) যুগ যুগ ধরে প্রাণে প্রশান্তি আনে।

★ **2. সম্পর্কের গুরুত্ব:**

আধুনিক গবেষণায় সামাজিক সংযুক্তি (social connectedness) সুখের শক্তিশালী পূর্বাভাসক হিসেবে চিহ্নিত। ইসলামে পারিবারিক দায়বদ্ধতা, ভ্রাতৃত্ব, ওযকফ/সদকা—এসবই সম্পর্কের ভিত্তি বিনির্মাণ করে।

★ **অর্থ ও অর্থবোধ (meaning):**

মানুষের লক্ষ্য/অর্থ থাকলেই কল্যাণ বৃদ্ধি পায় (eudaimonia)। ইসলামে জীবনকে আখিরাতের প্রস্তুতি হিসেবে দেখা—মানবজীবনকে স্পষ্ট অর্থ প্রদান করে।

★ **আচরণগত পরিবর্তন:**

CBT-ব্যবহারিক আচরণ পরিবর্তনের ধারণা—ইসলামেও নৈতিক নিয়মানুসারে রুটিন পরিবর্তনের (নফস্ নিয়ন্ত্রণ, রোজা ইত্যাদি) মাধ্যমে আচরণ ও অভ্যাস বদলে দেয়।

## ৩) অমিল ও তাত্ত্বিক বিভেদ (Points of divergence)

**অধিবিশ্ব (Metaphysical) ভিত্তি:**

মনোবিজ্ঞান সাধারণত প্রাকৃতিক/নিয়ামক (naturalistic) ব্যাখ্যা প্রদান করে—মন, ব্রেইন, পরিবেশগত কারণ।ইসলামী শিক্ষা সুখ ও আচরণ ব্যাখ্যা করে পরলোকে

(আখিরাত), আল্লাহর ইচ্ছা ও নৈতিক আদেশ–এর সঙ্গে যুক্ত করে। এই পার্থক্য নীতিগত: উদ্দেশ্য-ভিত্তিকতা (teleology)।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সুস্থতা ও কার্যকারিতা; ইসলামের লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণ—যা ব্যক্তিগত সুখকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে বুঝায়।

**থেরাপিউটিক পদ্ধতি:**

মনোবিজ্ঞানীর চিকিৎসা প্রোটোকল পরীক্ষা-নির্ভর; ইসলামী পদ্ধতি জিকির, দোয়া, স্পিরিচুয়াল কাউনসেলিং, তাওবা ইত্যাদি যোগ করে—কখনো কখনো পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বাইরে।

**স্টিগমা ও ধর্মীয় মানসিকতা:**

কিছু ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক রোগ নির্ণয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা (বলে 'শয়তান' বা 'সুদুর আধ্যাত্মিক পরীক্ষা') এলে চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপে বাধা পড়তে পারে; তাই সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় সমন্বয় প্রয়োজন।

**৪) বাস্তব প্রয়োগে সংঘাত ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা**

**সংঘাতের স্মারক:**

যখন ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা (উদাহরণ: মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার) নিয়ে আসে, ও যখন পরিবার ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিলে বিদ্যমান চিকিৎসা পিছিয়ে পড়তে পারে। আবার আধুনিক সাইকোথেরাপি ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে অমিল পেলে গ্রহণযোগ্যতা কমাতে পারে।

**সমন্বয়ের সুযোগ:**

ইন্টিগ্রেটিভ পদ্ধতি (integrated care): ক্লিনিকাল থেরাপি (CBT)-র সঙ্গে ইসলামী স্পিরিচুয়াল কৌশল (জিকির, দোয়া, সামাজিক সমর্থন) একত্র করলে ফল ভাল। বাস্তবে কিছু গবেষণা দেখিয়েছে (positive psychology ও religiosity মিলিয়ে) মানসিক স্বাস্থ্যে উন্নতি।

**মানসম্পন্ন সাংস্কৃতিক অভিযোজন:** থেরাপিস্টরা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন বুঝে কৌশল সাজালে রোগীর গ্রহণযোগ্যতা ও ফলাফল বেড়ে যায়।

## ৫) ইসলামী অনুশীলনগুলোর মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (কীভাবে কাজ করে)

**সালাত (Prayer):** নিয়মিত সালাত রুটিন-ভিত্তিকতা দেয় (structure), মাইন্ডফুলনেস বছরায় (focus) এবং সামাজিক/আধ্যাত্মিক সংযুক্তি বাড়ায়—এসব মনস্তাত্ত্বিকভাবে চাপ কমায়।

**জিকির ও দোয়া (Remembrance & Supplication):** রিল্যাক্সেশন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; কৃতজ্ঞতা অনুশীলন ডোপামিন/সন্তুষ্টি বাড়ায়—মানসিক সুস্থতায় সহায়ক।

**রোজা (Fasting):** আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রুটিন শেখায়; বিধিসম্মত রোজা মানসিক স্থিতি ও নৈতিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলে।

**সদকা/ওয়াকফ:** দান করলে আল্ট্রুইজম থেকে ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তি ও অর্থবোধ বৃদ্ধি পায়—psychology-এ "helper's high" নামে পরিচিত।

**সামাজিক বিধান (Family & Ummah):** সমর্থন নেটওয়ার্ক স্ট্রেস-বিরোধী; ইসলাম এই নেটওয়ার্ককে শক্ত করে।

## ৬) গবেষণাগত দিক: থিসিসের জন্য প্রস্তাবিত দিশা-নির্দেশ

**গবেষণা প্রশ্ন:** "ইসলামিক স্পিরিচুয়াল অনুশীলন (সালাত/জিকির/শুকর) ও আধুনিক থেরাপি (CBT/mindfulness)-এর সম্মিলিত প্রয়োগ কি ডিপ্রেসিভ উপসর্গ হ্রাসে কার্যকর?"

**পদ্ধতি:** মিশ্র পদ্ধতিগত (mixed-methods) — কোয়ান্টিটি: RCT বা কোহোর্ট; কুভাল: ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ (ধর্মপ্রাণ ও অপ্রাণ উভয় গ্রুপ)।

**মাপকাঠি/ইনডিকেটর:** WHO-5, PHQ-9, GAD-7, PERMA-মাপকাঠি, Religious Commitment Inventory ইত্যাদি।

**নমুনা:** বিভিন্ন বয়স, লিঙ্গ ও শহর-গ্রাম বিভাজন। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

**নৈতিক বিবেচনা:** ধর্মীয় ভাবাবেগ ও গোপনীয়তা রক্ষা; স্থানীয় ইমাম/ধর্মীয় নেতাদের সহায়তা নিলে সফলতা বাড়ে।

## উপসংহার

মনোবিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা—উভয়ই মানুষের সুখ ও মানসিক সুস্থতা অর্জনের অনন্য দিশা দেয়। মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতি দেয়; ইসলাম আত্মার প্রশান্তি, উদ্দেশ্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দ্বারা জীবনকে অর্থময় করে। যেসব সময়ে সংঘাত দেখা দেয়, সেখানে ইন্টিগ্রেটিভ এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। থিসিসে তুমি এই তুলনায়

একটি নির্দিষ্ট হাইপোথিসিসে (উদাহরণ: "সালাত+CBT একত্রে ডিপ্রেসিভ উপসর্গ কমায়") RCT চালালে গুরুতর ও নতুন অবদানে পৌঁছতে পারবে।

## অধ্যায় ৭: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ

### ৭.১ ব্যক্তিগত জীবন → তাকওয়া, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃত সুখ ও শান্তি অর্জন। কিন্তু সেই সুখ কেবল বাইরের জৌলুস, অর্থ, বা খ্যাতিতে নয়—বরং নিহিত থাকে অন্তরের প্রশান্তি ও আত্মিক পরিতৃপ্তিতে। ইসলাম এই অন্তরভিত্তিক সুখকে কেন্দ্র করে মানুষকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনপথ দেখিয়েছে, যার ভিত্তি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে—তাকওয়া, ইবাদত, এবং আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া)।

**১. তাকওয়া — অন্তরের ভয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা থেকে জন্ম নেওয়া সুখ**

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা এবং আত্মসংযম। কোরআনে তাকওয়াকে বলা হয়েছে প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি।

আল্লাহ তাআলা বলেন— **"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ সৃষ্টি করেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত ২–৩)**

তাকওয়াসম্পন্ন মানুষ আল্লাহর উপস্থিতি সর্বক্ষণ অনুভব করে। এই চেতনা তাকে অন্যায়, মিথ্যা, লোভ ও হিংসা থেকে বিরত রাখে। ফলে তার মন হয় স্বচ্ছ, আত্মা হয় নির্মল, এবং তার ভেতর এক প্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির অনুভূতি জন্ম নেয়।এই আল্লাহভীতিই মানুষকে আত্মিক নিরাপত্তা দেয়—যা কোনো পার্থিব ভোগবিলাস দিতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,**"তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো; কোনো খারাপ কাজ করলে তার পরে একটি ভালো কাজ করে ফেলো, যা সেটিকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো।"(তিরমিজি, হাদীস: ১৯৮৭)**

এই তাকওয়া মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে, যা মানসিক প্রশান্তি ও সুখের মূল ভিত্তি।

**২. ইবাদত — আল্লাহর স্মরণে আত্মার শান্তি**

ইবাদত মুসলমানের জীবনের প্রাণ। নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ—এসব শুধু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আত্মাকে আল্লাহর নিকট সংযুক্ত করার উপায়। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং জীবনকে একটি অর্থপূর্ণ ধারায় পরিচালিত করে।

কোরআনে আল্লাহ বলেন—**"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ, আয়াত ২৮)**

যখন মানুষ দুনিয়ার উদ্বেগ, ব্যর্থতা ও ভয়ের মাঝে ডুবে যায়, তখন ইবাদতই তাকে মানসিক আশ্রয় দেয়। নামাজের সময় সে সকল চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে; এই আত্মসমর্পণ থেকেই আসে রূহের প্রশান্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ সম্পর্কে বলেছিলেন, **"আমার চোখের শীতলতা নামাজে।"(নাসায়ী, হাদীস: ৩৯৩৯)** অর্থাৎ, ইবাদতের মাধ্যমে তার অন্তর প্রশান্ত হতো, কারণ নামাজ ও জিকির আল্লাহর নিকট আত্মাকে বিশ্রাম দেয়। একজন মু'মিন যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে আসে, তখন সে দুঃখ ও কষ্টেও শান্ত থাকে, কারণ সে জানে—সব কিছু আল্লাহর হাতে।

**৩. আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) — অন্তরের কলুষতা থেকে মুক্তি**

আত্মশুদ্ধি ইসলামি জীবনের একটি মৌলিক দিক। এটি মানুষকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে, তার হৃদয়কে পবিত্র করে তোলে।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—**"নিশ্চয়ই সফল সে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর ব্যর্থ সে, যে তাকে কলুষিত করেছে।" (সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯–১০)**

তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি মানে হলো নিজের নফস (অহংকার, কামনা, লোভ, রাগ, হিংসা) নিয়ন্ত্রণ করা এবং হৃদয়কে ঈমান, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, ও দয়ার গুণে পূর্ণ করা।একজন আত্মশুদ্ধ মানুষ তার আনন্দ খোঁজে বাহ্যিক সাফল্যে নয়, বরং অন্তরের পরিতৃপ্তিতে। যখন সে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন সে সত্যিকার অর্থে হালকা ও মুক্ত বোধ করে। এই মুক্ত অনুভূতিই প্রকৃত সুখ।

**৪. কোরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যক্তিগত সুখের ব্যাখ্যা**

কোরআন বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার জীবনের প্রাচুর্য ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ বলেন—**"এই পার্থিব জীবন কেবল খেলা ও আমোদপ্রমোদ; কিন্তু পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন—যদি তারা জানতো।" (সূরা আনকাবূত, আয়াত ৬৪)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

**“সত্যিকারের সম্পদ অর্থের প্রাচুর্যে নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তিতেই।”(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৪৬)**

এই আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট করে যে, প্রকৃত সুখের স্থান বাহিরে নয়—অন্তরে। একজন আল্লাহভীরু, পরিশুদ্ধ, ইবাদতনিষ্ঠ মানুষ কষ্টের মধ্যেও প্রশান্ত থাকতে পারে; আর যে তাকওয়া ও তাযকিয়া থেকে বঞ্চিত, সে প্রাচুর্যের মাঝেও উদ্বিগ্ন থাকে।

**৫. সারসংক্ষেপ**

ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃত সুখ অর্জনের জন্য ইসলাম তিনটি স্তম্ভ নির্ধারণ করেছে—তাকওয়া, ইবাদত, ও আত্মশুদ্ধি।তাকওয়া মানুষকে অন্তর থেকে সৎ ও সচেতন করে; ইবাদত তাকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে; এবং আত্মশুদ্ধি তাকে মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য দেয়।এই তিনটির সমন্বয়ে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সুখী হয়।

প্রকৃত সুখ তাই কোনো বাহ্যিক অবস্থায় নয়, বরং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও অন্তরের পরিশুদ্ধিতেই নিহিত।

### ৭.২ পারিবারিক জীবনে সুখ: দাম্পত্য শান্তি ও পিতা-মাতার খেদমত

ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুখ ও প্রশান্তির কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে।মানুষের ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক স্থিতি—উভয়ই নির্ভর করে পরিবারের শান্তি ও ঐক্যের উপর।কোরআনে পরিবারকে বলা হয়েছে “মওয়াদ্দাহ ও রহমাহ” (ভালোবাসা ও করুণা)-এর আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

**“তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা রূম, আয়াত ২১)**

**১. দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা**

দাম্পত্য সম্পর্কের মূলে রয়েছে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহনশীলতা। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পারস্পরিক দায়িত্বের সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে—কেউ কারো শাসক নয়, বরং উভয়েই একে অপরের পোশাকের মতো সুরক্ষা দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

**“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে।”(তিরমিজি, হাদীস: ৩৮৯৫)**

যখন দাম্পত্য সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি সম্মান, মাফ ও সহযোগিতা থাকে, তখন সেই ঘরেই আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।এই অভ্যন্তরীণ শান্তিই পারিবারিক সুখের মূল উৎস।

**২. পিতা-মাতার খেদমত ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ**

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও সেবা করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে।কোরআনে বারবার বলা হয়েছে—

**"তোমার প্রভু আদেশ করেছেন যে, তুমি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২৩)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—**"জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে।" (নাসায়ী, হাদীস: ৩১০৪)**

পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা শুধু পারিবারিক বন্ধন মজবুত করে না; এটি আত্মারও পরিশুদ্ধি ঘটায়।যে সন্তান তার পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করে, আল্লাহ তার জীবনে বারাকাহ দেন—এটাই প্রকৃত পারিবারিক সুখের রহস্য।

**৩. সন্তানদের প্রতি দয়া ও নৈতিক শিক্ষা**

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের প্রতি গভীর স্নেহ দেখাতেন। তিনি বলতেন— **"যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"(তিরমিজি, হাদীস: ১৯২১)**

একটি পরিবার তখনই প্রকৃত অর্থে সুখী হয়, যখন সন্তানরা ভালোবাসা, দয়া ও ইসলামী আদর্শে বেড়ে ওঠে।নৈতিক শিক্ষা, ইমান, ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি—এসবই পারিবারিক সুখের ভিত্তি গড়ে তোলে।

**৪. পারিবারিক সুখের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সারসংক্ষেপ**

- দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি: ভালোবাসা, মাফ ও সহযোগিতা।
- পিতা-মাতার সন্তুষ্টি: আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ।
- সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা: ভবিষ্যৎ সমাজের স্থিতি ও শান্তির ভিত্তি।

ইসলাম পরিবারকে শুধু রক্তের বন্ধন নয়, বরং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে দেখেছে।পরিবারের এই আভ্যন্তরীণ প্রশান্তিই সমাজে স্থিতি ও সামগ্রিক সুখের মূল উৎস।

### ৭.৩ সামাজিক জীবনে সুখ: ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, যাকাত ও দান

একটি সমাজ তখনই সুখী হয়, যখন তার ভিত্তি ন্যায়বিচার, পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সমবেদনায় গঠিত হয়।ইসলাম সামাজিক জীবনে এমনই এক

ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ দিয়েছে, যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব পরস্পরের পরিপূরক।

**১. ন্যায়বিচার — সমাজের প্রশান্তির ভিত্তি**

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন— **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন ন্যায়বিচার করতে, সৎকর্ম করতে ও আত্মীয়স্বজনকে দান করতে।"(সূরা নাহল, আয়াত ৯০)**

ন্যায়বিচার হলো সমাজের শান্তির কেন্দ্রবিন্দু। অন্যায়ের উপর টিকে থাকা সমাজ কখনোই প্রকৃত সুখ ভোগ করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন—**"তোমরা জেনে রাখো, যারা অন্যায় করবে, কিয়ামতের দিনে তাদের জন্য অন্ধকার হবে।"(বুখারী, হাদীস: ২৪৪৭)**

**২. ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা**

ইসলাম সব মুসলমানকে এক শরীরের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে।**"মুমিনরা পরস্পরের ভাই।" (সূরা হুজরাত, আয়াত ১০)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—**"এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য সেই দেয়ালের মতো, যার একটি অংশ অন্য অংশকে শক্ত করে রাখে।" (বুখারী, হাদীস: ৪৮১)**

সামাজিক সুখের জন্য প্রয়োজন—ভালোবাসা, পারস্পরিক সাহায্য, হিংসা থেকে মুক্তি ও সহযোগিতার মানসিকতা।যেখানে মানুষ একে অপরের কষ্টে পাশে দাঁড়ায়, সেখানেই সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৩. যাকাত ও দান — সামাজিক সমতার হাতিয়ার**

ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যাকাত ও সদকা ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করেছে।যাকাত ধনীদের সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, আর দরিদ্রদের জীবনে এনে দেয় মর্যাদা ও স্থিতি।

**"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত নাও, যা তাদের পরিশুদ্ধ করবে ও পবিত্র করবে।"(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩)**

যখন সমাজে দানশীলতা ও মানবিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়, তখন শ্রেণিবিভেদ কমে যায়, এবং পারস্পরিক আস্থা জন্ম নেয়।এই সামাজিক ভারসাম্যই আসল সুখের ভিত্তি।

**৪. সারসংক্ষেপ**

সামাজিক সুখ মানে শুধু অর্থনৈতিক স্থিতি নয়, বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক সমন্বয়।ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা চায় যেখানে—ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত,মানুষ পরস্পরের ভাইয়ের মতো আচরণ করে,ধনী দরিদ্রের পার্থক্য মুছে গিয়ে সমবেদনা জন্ম

নেয়।এমন সমাজেই মানুষ প্রকৃত অর্থে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে—যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ পায়।

৭.৪: রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ — ন্যায়নিষ্ঠ শাসক ও সামাজিক সমতা

রাষ্ট্র হলো সমাজের আয়না।একটি সমাজের সুখ, শান্তি ও স্থিতি মূলত নির্ভর করে তার নেতৃত্ব ও প্রশাসনের ন্যায়পরায়ণতার উপর।ইসলামে রাষ্ট্র শুধু রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং ন্যায়, কল্যাণ ও ঈমানভিত্তিক জীবনব্যবস্থার প্রতিফলন।কোরআন ও হাদীস রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীলতা এবং জনকল্যাণকে সুখের মূল শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

**১. ন্যায়নিষ্ঠ শাসক — রাষ্ট্রীয় প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু**

ইসলামে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।তিনি শুধু প্রশাসক নন, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত রক্ষাকারী।

আল্লাহ তাআলা বলেন:**"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তাদের হকদারদের নিকট পৌঁছে দেবে এবং মানুষদের মধ্যে বিচার করলে ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা নিসা, আয়াত ৫৮)**

এই আয়াত ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারণ করেছে—ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতা ছাড়া রাষ্ট্রে প্রকৃত সুখ আসতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহ তাঁর ছায়ায় রাখবেন যেদিন অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ন্যায়পরায়ণ শাসক।"(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)**

ন্যায়নিষ্ঠ শাসক জনগণের আস্থা অর্জন করেন, অন্যায়ের পথ বন্ধ করেন, এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।যেখানে নেতৃত্ব ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই জনগণের মনে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি জন্ম নেয়—এটাই রাষ্ট্রীয় সুখের প্রথম ধাপ।

**২. শাসকের দায়িত্ব ও জনগণের অধিকার**

ইসলাম রাষ্ট্রকে একটি পারস্পরিক দায়িত্বের সম্পর্ক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— **"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।ইমাম (শাসক) দায়িত্বশীল তার অধীনস্থদের বিষয়ে।"(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩)**

এই হাদীস স্পষ্টভাবে বলে—শাসক যদি তার জনগণের অধিকার রক্ষা করে, তবে সে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে;অন্যায় করলে জবাবদিহিতার মুখে পড়বে।

একটি রাষ্ট্র তখনই সুখী হয়, যখন জনগণের মৌলিক অধিকার—খাদ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা, ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্য ও মর্যাদা—সবকিছু নিশ্চিত হয়।ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের কল্যাণে নিবেদিত, শোষণ বিশেষ সুবিধাভোগীর নয়।

**৩. সামাজিক সমতা — ইসলামী রাষ্ট্রের মূল নীতি**

ইসলাম শ্রেণিবৈষম্যকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে ঘোষণা করেন—

**"কোনো আরবের উপর অনারবের, কোনো অনারবের উপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের, কিংবা কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ায়।" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩৪৮৯)**

এখানে ইসলামী সমাজে সুখের চাবিকাঠি বলা হয়েছে তাকওয়া ও সমতা।যেখানে অন্যায় বৈষম্য নেই, সেখানে হিংসা ও ঘৃণার স্থানও নেই।ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিক—মুসলিম হোক বা অমুসলিম—সমানভাবে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের অধিকারী।এই সমতা মানুষের অন্তরে নিরাপত্তা, সম্মান ও সুখের বীজ রোপণ করে।

**৪. জনগণের দায়িত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা**

রাষ্ট্রীয় সুখ একতরফা বিষয় নয়।যেমন শাসকের দায়িত্ব আছে, তেমনি জনগণেরও আছে—আইন মেনে চলা, শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সমাজে নৈতিকতা রক্ষা করা।

কোরআনে বলা হয়েছে**"হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশালী তাদের।"(সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)**

এই ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কই রাষ্ট্রে স্থিতি আনে।যখন জনগণ আইন মানে ও শাসক ন্যায়পরায়ণ থাকে— তখনই সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা ও প্রকৃত সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৫. রাষ্ট্রীয় সুখের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সারসংক্ষেপ**

- রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার হলো সুখের ভিত্তি।
- শাসক অমানতের রক্ষক, নয়তো ক্ষমতার ভোগী।
- জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব উভয়ই ইসলামী নীতির অংশ।
- সমতা ও নৈতিকতা ছাড়া রাষ্ট্রে শান্তি স্থায়ী হয় না।

সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সুখ বলতে বোঝায়—একটি এমন সমাজব্যবস্থা যেখানে ন্যায়, করুণা, সমতা ও আল্লাহভীতি একত্রে কাজ করে।যেখানে ক্ষমতা নয়, বরং দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা প্রাধান্য পায়—সেখানেই মানুষের অন্তরে ও রাষ্ট্রে প্রকৃত সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ভূমিকা

ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত বা জাতীয় নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে। ইসলাম এক বৈশ্বিক ন্যায়, মানবতা ও পারস্পরিক সহাবস্থানের ধর্ম। কোরআনের বার্তা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রেরিত —

**"আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ ﷺ) সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"— (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১০৭)**

অতএব, আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী শিক্ষার এক মৌলিক লক্ষ্য।

## ১. বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব ও মানবসমতা

ইসলাম ঘোষণা করেছে, সব মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি, তাই জাতি, ভাষা বা বর্ণের পার্থক্য কারও মর্যাদা নির্ধারণ করে না। কোরআনে বলা হয়েছে —

**"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"— (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)**

এই আয়াত মানবজাতির ঐক্য ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক নীতি এই মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত — শ্রদ্ধা, ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

## ২. যুদ্ধ নয়, শান্তির আহ্বান

ইসলাম কখনোই যুদ্ধকে উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রয়োজনের তাগিদে অনুমোদিত করেছে। কোরআনে বলা হয়েছে — **"আর যদি তারা শান্তির দিকে আগ্রহী হয়, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো।" — (সূরা আল-আনফাল ৮:৬১)**

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা দেখায় যে ইসলাম কূটনীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

## ৩. আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের সংরক্ষণ

ইসলামী রাষ্ট্র কেবল নিজের নাগরিকের প্রতি নয়, অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতে বাধ্য। ইসলাম আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ন্যায়বিচার, চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা ও মানবাধিকারের সম্মান নিশ্চিত করেছে।

কোরআন বলছে —**"আর কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায়ের দিকে ঠেলে না দেয়। ন্যায়বিচার কর; এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।"— (সূরা আল-মায়িদা ৫:৮)**
ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায়, খলিফা উমর (রা.) এমনকি অমুসলিম প্রজাদের প্রতিও সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিলেন। এটি ইসলামী রাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিক মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

**৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কল্যাণমূলক ভূমিকা**

ইসলাম বৈশ্বিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে— তা শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, চিকিৎসা, কিংবা দুর্যোগ মোকাবেলায় হোক।
কোরআনে বলা হয়েছে —**"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো।"— (সূরা আল-মায়িদা ৫:২)**
এই নির্দেশনা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথেও মানবিক সহযোগিতা, শান্তি ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। আধুনিক যুগে এটি "ইসলামী মানবতা" (Islamic Humanitarianism)-এর নৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**৫. ইসলামের বৈশ্বিক শান্তির দর্শন**

ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো "সালাম" — শান্তি। "ইসলাম" শব্দটিও এসেছে "সালাম" (শান্তি) শব্দমূল থেকে। প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন — **"মুসলমান সে-ই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।"— (সহিহ বুখারি)**
অতএব, ইসলামী শান্তির আদর্শ জাতিসীমা পেরিয়ে সমগ্র মানবসমাজের নিরাপত্তা ও মঙ্গল কামনা করে।

**উপসংহার**

আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি কেবল চুক্তি বা সামরিক ভারসাম্যের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এটি সম্ভব নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। ইসলাম এই তিন নীতিকেই কেন্দ্র করে এক বৈশ্বিক শান্তি ও মানবকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে।অতএব, কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রকৃত সুখ ও শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সমাজ — সকল স্তরে আল্লাহভীতির আলোকে ন্যায় ও মানবতার চর্চা হয়।

ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে সুখকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা (Holistic System) হিসেবে ব্যাখ্যা করে।

- ব্যক্তি → তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি
- পরিবার → ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ
- সমাজ → ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব
- রাষ্ট্র → ন্যায়নিষ্ঠ শাসন
- বিশ্ব → শান্তি ও মানবতা

সব ক্ষেত্রের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।যে ব্যক্তি এই সমন্বিত জীবনচর্চা করে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সুখী — দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে।

## অধ্যায় ৮: আত্মশুদ্ধি ও সুখের সম্পর্ক

### ৮.১ আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা

**১) সারসংক্ষেপে সংজ্ঞা**

আত্মশুদ্ধি (تَزْكِيَة — Tazkiyah) বলতে বোঝায় হৃদয় এবং আত্মাকে কলুষ (দুনিয়াবাসনা, লোভ, কুসংস্কার, অহংকার, রাগ ইত্যাদি) থেকে মুক্ত করে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কেবল আচার-আচরণ বদলানো নয়, বরং অন্তরের অবস্থা পরিবর্তনের গভীর কাজ — যে ফলে ব্যক্তি স্থায়ী সুখ, মানসিক স্থিতি ও আল্লাহর নিকট সন্তুষ্টি অর্জন করে।উপসংহারে: আত্মশুদ্ধি = অন্তরের সংশোধন + আধ্যাত্মিক সংযম + নৈতিক বাস্তবায়ন।

**২) কোরআন-হাদিসে স্বরূপ ও প্রমাণ**

কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

**“নিশ্চয়ই সফল সে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে; আর ব্যর্থ সে, যে তাকে কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস 91:9–10 — মর্মার্থ)**

রাসূল ﷺ বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা দেয় তাঁর অন্তর ও নৈতিকতা; শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিই যথেষ্ট নয় (সহীহ হাদীসসমূহে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বর্ণিত)।

**৩) আত্মশুদ্ধির উপ-ধরণ (Taxonomy)**

আত্মশুদ্ধি একক নয়; এটি বহুস্তরীয় — নিচে প্রস্তাবিত শ্রেণিবিভাগ

**নফসের শুদ্ধি (Purification of the Nafs)**

অর্থ: স্বল্পসুবিধা, কাম, হিংসা, আত্ম-তৃপ্তি ইত্যাদি তাড়না নিয়ন্ত্রণ।

কায়দা: রোজা, ইবাদত-বাধ্যতা, কৃতজ্ঞতার চর্চা।

**হৃদয়ের শুদ্ধি (Purification of the Qalb)**

অর্থ: হৃদয়ের দাগ (রিয়াকরিতা, দুশ্চিন্তা, সন্দেহ) দূর করা।

কায়দা: জিকির, তাওবা, কোরআন-পাঠ, মনন-চিন্তা (tafakkur).

**আচরণিক শুদ্ধি (Purification of Actions — Amal)**

অর্থ: বিবেকের মতে কর্ম স্থিরকরণ — সততা, ন্যায়পরায়ণতা।

কায়দা: নিয়মিত ইমানি কাজ, সঙ্ঘবদ্ধ আত্মোন্নয়ন (accountability).

**ভাষার শুদ্ধি (Purification of the Tongue — Lisan)**

অর্থ: গীবত, মিথ্যা, দুর্ব্যবহার পরিহার।

কায়দা: আত্ম-নিয়ম, ভালো সঙ্গ, জ্ঞানের আলোকে কথাবার্তা পরিচালনা।

**দৃষ্টির শুদ্ধি (Purification of the Sight — Basar)**

অর্থ: অবাঞ্ছিত দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ (যেমন ফিতনা এড়ানো)।

কায়দা: পর্দা, সংযম, চাহিদার পুনরীক্ষণ।

**৪) আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য (Objectives / Maqasid)**

আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলোকে নিম্নরূপ:

অল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন — আধ্যাত্মিক পুরস্কার ও নিকটতার উদ্দেশ্য।

আন্তরিক শান্তি (Sukoon) — অন্তরের স্থিতিশীলতা ও দুশ্চিন্তা হ্রাস।

নৈতিকতা ও সামাজিক কল্যাণ — সুস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে সুস্থ পরিবার ও সমাজ নিশ্চিত করা।

আচরণগত স্থায়িত্ব — অস্থায়ী আবেগের পরিবর্তে স্থায়ী নৈতিক অভ্যাস সৃষ্টি।

**৫) আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি (Practical Framework)**

**স্ব-জ্ঞান (Self-awareness & Ilm)**

জ্ঞান অর্জন: কোরআন-তাফসীর, হাদিস, আধ্যাত্মিক গ্রন্থ (Al-Ghazali ইত্যাদি)।

মুহাসাবাহ (self-accounting) — দৈনিক/সাপ্তাহিক reflection journal।

**তাওবা ও রিয়াজাত (Repentance & Discipline)**

আন্তরিক তাওবা; ক্ষতির প্রতিকার (if applicable)।

রিয়াজাত: আত্মিক শুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর সাধনা।যেমন: রোজা,নফল ইবাদাত, জিকির ইত্যাদির মাধ্যমে নফস নিয়ন্ত্রণ।

**জিকির ও ইবাদত (Remembrance & Worship)**

নিয়মিত জিকির ও সালাত; কোরআন পাঠ; তাহাজ্জুদ।

mindfulness-সদৃশ আধ্যাত্মিক অনুশীলন: নিশ্ছিদ্র উপস্থিতি (presence) ইসলামী চর্চায় পাওয়া যায়।

**নৈতিক চর্চা ও সামাজিক অনুশীলন**

সদকা, সেবা, ন্যায়বিচার প্রয়োগ।সৎ সঙ্গ - পরিবেশজাতসহায়তা; community accountability groups।

**ধারাবাহিক মূল্যায়ন**

ব্যক্তিগত সূচক: দৈনিক মুহাসাবাহ

বাহ্যিক সূচক: পরিবার/কমিউনিটি রিপোর্ট, আচরণগত পরিবর্তন।

**৬) মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা — কেন আত্মশুদ্ধি সুখ বাড়ায়? (Mechanisms)**

ইসলামিক পদ্ধতিগুলো আধুনিক সাইকোলজির নানা কার্যকারিতার সাথে মিলে যায়:

1. **মানসিক স্থিতি (Emotional regulation):** জিকির, দোয়া ও রাতের ইবাদত শরীর ও মস্তিষ্কে রিল্যাক্সেশন-রেসপন্স সৃষ্টি করে; স্ট্রেস-হরমোন হ্রাস পায়।

2. **কগনিটিভ রিফ্রেমিং (Cognitive restructuring):** মুহাসাবাহ ও তাওবা ব্যক্তিকে তার নেতিবাচক চিন্তা চিহ্নিত করে বদলের পথ শেখায় (CBT-সদৃশ)।

3. **সামাজিক সংযোজন (Social connectedness):** সেবা, দান ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ সামাজিক সমর্থন বাড়ায়—মানসিক সুস্থতার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাসক।

4. **অল্ট্রুইজম-ইফেক্ট (Helper's high):** দান ও সাহায্য করলে নিউরোবায়োলজিকালি পজিটিভ অনুভূতি উদ্দীপ্ত হয়—আত্মমর্যাদা ও সুখ বাড়ে।

5. **অর্থ ও উদ্দেশ্য (Meaning & Purpose):** আখিরাতমুখী জীবনদর্শন জীবনে গভীর অর্থ দেয়—eudaimonic well-being উন্নত

**উপসংহার**

আত্মশুদ্ধি (Tazkiyah) কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে পরিপক্ক করে এবং মানসিক-আধ্যাত্মিক স্থিতি প্রদান করে। থিসিস পর্যায়ে আত্মশুদ্ধি শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয় — বরং ইন্টারভেনশন, পরিমাপ এবং গবেষণামূলক যাচাইয়ের জন্য সমৃদ্ধ ক্ষেত্র।

আত্মশুদ্ধি (تَزْكِيَةُ النَّفْس) মানুষের আত্মা, মন ও আচরণের এমন এক শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সে নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং আল্লাহর নিকটে প্রশান্তি অর্জন করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা শুধু ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং প্রকৃত সুখ ও মানসিক প্রশান্তির মৌলিক উপাদান।নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো—

### ১. কুরআনের দৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধির অপরিহার্যতা

আল্লাহ তাআলা বলেন— **"যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে।"— সূরা আশ-শামস: ৯** এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা ও সুখ আত্মার পরিশুদ্ধির মধ্যেই নিহিত। যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে (নফস) নিয়ন্ত্রণে রেখে সৎপথে পরিচালিত করে, তার অন্তরে আসে প্রশান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।

### ২. হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

**"দেহে একটি অঙ্গ আছে, সেটি ভালো থাকলে পুরো দেহ ভালো থাকে, আর তা যদি নষ্ট হয়, পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। সেটি হলো হৃদয়।" — সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২**

এই হাদীস আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে গভীরভাবে তুলে ধরে। হৃদয়ের পবিত্রতা (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা) ছাড়া বাহ্যিক ইবাদত বা সামাজিক আচরণ পূর্ণাঙ্গ হয় না।

### ৩. আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের প্রশান্তি

আত্মশুদ্ধি মানুষকে নেতিবাচক চিন্তা, হিংসা, অহংকার, লোভ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে। ফলে তার অন্তর হয়ে ওঠে শান্ত, স্থির ও আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ।

আল্লাহ বলেন—**"যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়— জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি পায়।"— সূরা রা'দ: ২৮**

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির ফলেই মানুষ আল্লাহর স্মরণে প্রকৃত সুখ অনুভব করে, যা ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

### ৪. নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে আত্মশুদ্ধির ভূমিকা

আত্মশুদ্ধ মানুষ ন্যায়, সহমর্মিতা, দয়া ও নৈতিক আচরণের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। একজন শুদ্ধ আত্মার অধিকারী ব্যক্তি অন্যের প্রতি হিংসা বা ঘৃণা পোষণ করে না। ফলে তার মধ্য থেকে উদ্ভাসিত হয় সমাজে শান্তি ও ভালোবাসা।

**৫. আত্মশুদ্ধি ও আখিরাতের সফলতা**

আত্মশুদ্ধি শুধু দুনিয়ার সুখ নয়, আখিরাতের মুক্তিরও পথ।আল্লাহ তাআলা বলেন— **"যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" — সূরা আল-আ'লা: ১৪**

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি দুনিয়ার প্রশান্তি ও পরকালের জান্নাত— উভয় অর্জনের মাধ্যম।

**উপসংহার:**

আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত সুখের কোনো বিকল্প নেই। আত্মশুদ্ধি মানুষকে নৈতিকভাবে দৃঢ়, অন্তর প্রশান্ত ও আল্লাহর নিকটে প্রিয় করে তোলে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীস আত্মশুদ্ধিকে সুখ, সাফল্য ও মুক্তির মূল চাবিকাঠি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

৮.৩ অন্তরের রোগ (হিংসা, অহংকার, লোভ, রিয়া)

আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অন্তরের রোগসমূহ — যেমন হিংসা, অহংকার, লোভ ও রিয়া (লোকদেখানো আমল)।এই রোগগুলো মানুষকে অন্তর্দহন, মানসিক অশান্তি ও আত্মিক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।কুরআন ও হাদীসের আলোকে এগুলোর কারণ, ক্ষতি ও পরিত্রাণের উপায় নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

**১. হিংসা (Hasad)**

**সংজ্ঞা:**অন্যের প্রাপ্ত অনুগ্রহ দেখে মনে কষ্ট পাওয়া এবং তা হারিয়ে যাক — এমন কামনা করাই হিংসা।

কুরআনের দৃষ্টিতে: **"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে হিংসা করে যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন।"— সূরা আন-নিসা: ৫৪**

**ক্ষতি:**হিংসা হৃদয়কে জ্বালায় এবং মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়।এটি সম্পর্ক নষ্ট করে, সমাজে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— **"হিংসা সৎকর্মগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করে, যেমন আগুন কাঠকে পোড়ায়।"— আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯০৩**

সমাধান:

- আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা (কানাআত)।
- অন্যের নেয়ামত দেখে দোয়া করা ও নিজের জন্য বরকত চাওয়া।
- কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

**২. অহংকার (Kibr)**

**সংজ্ঞা:**

নিজেকে বড় ভাবা এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করা।

কুরআনের দৃষ্টিতে:**"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।"— সূরা নাহল: ২৩**

হাদীস:**"যার অন্তরে সরিষা দানার সমান অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১**

**ক্ষতি:**

অহংকার মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।আত্মশুদ্ধির পথ বন্ধ করে দেয়, কারণ অহংকারী ব্যক্তি নিজের ত্রুটি দেখতে পারে না।

সমাধান:

- বিনয় ও আত্মসমালোচনার অভ্যাস করা।
- বুঝতে হবে, সব কৃতিত্ব ও মর্যাদা আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়।
- নবী ﷺ-এর নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার চর্চা অনুসরণ করা।

### ৩. লোভ ( Hirs)

**সংজ্ঞা:**

অতিরিক্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, যা সীমা অতিক্রম করে যায়।

কুরআনের দৃষ্টিতে:

**"তোমরা পার্থিব জীবনের মোহে মগ্ন থেকো না; এই জীবন তো কেবল এক অল্পকালীন ভোগ।"— সূরা আল-আলা: ১৬–১৭**

**ক্ষতি:**

লোভ অন্তরে অশান্তি ও অস্থিরতা আনে, কারণ মানুষ কখনো পরিতৃপ্ত হয় না।লোভ থেকেই জন্ম নেয় মিথ্যা, প্রতারণা ও অন্যায়ের প্রবণতা।

সমাধান:

- কানাআত (সন্তুষ্টি) অর্জন করা — "যে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, সে ধনী।"
- যাকাত, দান ও সদকা দিয়ে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা।
- মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাতের হিসাব মনে রাখা।

### ৪. রিয়া (Riya) — লোক দেখানো আমল

**সংজ্ঞা:**

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা বা ভালো কাজ করা।

কুরআনের দৃষ্টিতে: **"তারা নামাজ পড়ে লোক দেখানোর জন্য।" — সূরা মাউন: ৪–৬**

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় করি ছোট শিরককে।” সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছোট শিরক কী?’ তিনি বললেন, “রিয়া।” — মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২৩৬৩০

**ক্ষতি:**

রিয়া মানুষকে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে ফেলে দেয়।আমলের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করে, কারণ আল্লাহ শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ আমল গ্রহণ করেন।

সমাধান:

- ইখলাস (খাঁটি নিয়ত) তৈরি করা।
- গোপনে আমল করার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- প্রতিটি কাজের আগে মনে করা— “আমি এটা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি।”

**উপসংহার:**

হিংসা, অহংকার, লোভ ও রিয়া — এ চারটি রোগ আত্মাকে কলুষিত করে, অন্তর থেকে শান্তি ও সুখ কেড়ে নেয়।আত্মশুদ্ধি মানে হলো এই রোগগুলোকে চিনে ফেলা, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং আল্লাহর সাহায্যে অন্তরকে নির্মল রাখা।

প্রকৃত সুখ আসে তখনই, যখন অন্তর আল্লাহভীতিতে ভরে যায় এবং মন থেকে বিদ্বেষ, লোভ, অহংকার ও কৃত্রিমতা দূর হয়।

### ৮.৪ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রশান্তি

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নফস হলো মানুষের অন্তরের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি, যার মাধ্যমে হৃদয় আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ফিরে আসে।

কুরআন ও হাদীস বারবার মানুষকে আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে, কারণ সত্যিকারের সুখ বাহ্যিক নয় — অন্তরের শান্তি থেকেই উদ্ভূত।

**১. কুরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধির ফল**

আল্লাহ তায়ালা বলেন —**“নিশ্চয়ই সফল সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, এবং ব্যর্থ সে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।” — সূরা আশ-শামস: ৯–১০**

এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে মানুষের সাফল্য, সুখ ও প্রশান্তি নির্ভর করে তার আত্মার পবিত্রতার উপর।যে ব্যক্তি নিজের মনকে হিংসা, লোভ, রিয়া, ঘৃণা থেকে মুক্ত রাখে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সুখী।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন —

**“যে আল্লাহর কাছে নির্মল অন্তর নিয়ে আসে, কেবল সেই-ই নিরাপদ থাকবে।” — সূরা আশ-শু‘আরা: ৮৯**

অর্থাৎ, আত্মার পবিত্রতাই আখিরাতে নিরাপত্তা ও দুনিয়াতে প্রশান্তির চাবিকাঠি।

**২. আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের প্রশান্তি (সাকিনা)**

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরে জন্ম নেয় সাকিনা — অর্থাৎ গভীর প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা।যখন একজন মানুষ আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত, কৃতজ্ঞতা ও তাকওয়ার চর্চা করে, তখন তার হৃদয় থেকে ভয় ও উদ্বেগ দূর হয়ে যায়।

**“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।” — সূরা রা‘দ: ২৮**

এই প্রশান্তি বাহ্যিক সাফল্যের সঙ্গে নয়, বরং আত্মিক সংযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত।যে মানুষ নিজের নফসের খারাপ প্রবণতাকে দমন করে, সে দুঃখের মাঝেও শান্তি অনুভব করতে পারে — কারণ তার আত্মা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

**৩. নবী ﷺ এর শিক্ষায় আত্মশুদ্ধি ও সুখের সম্পর্ক**

রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মশুদ্ধির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে “আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অন্তরের নির্মলতা”-কে গুরুত্ব দিয়েছেন।তিনি বলেন —

**“সতর্ক হও! দেহে এক টুকরা মাংস আছে; যদি তা শুদ্ধ থাকে, পুরো শরীরই শুদ্ধ হয়, আর যদি তা কলুষিত হয়, পুরো শরীরই কলুষিত হয় — সেটি হলো হৃদয়।”— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২**

অতএব, আত্মশুদ্ধি মূলত হৃদয়ের সংশোধন।যখন হৃদয় শুদ্ধ হয়, তখন মানুষ অন্যের প্রতি হিংসা করে না, অন্যায়ের পথ বেছে নেয় না, বরং দয়া, সহমর্মিতা ও ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।এই অবস্থাই প্রকৃত সুখের অবস্থান।

**৪. আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য ও সুখ**

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে — মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মূল কারণ হলো অতৃপ্তি ও আত্মিক শূন্যতা।ইসলাম এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

যখন মানুষ আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখে, নিয়তকে খাঁটি রাখে এবং পরকালের জবাবদিহিতা স্মরণ করে, তখন তার অন্তর স্থির হয়।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি আসে কারণঃ

- এটি মানুষকে অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত করে।

- অন্যের প্রতি ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতা শেখায়।
- নিজের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে আল্লাহর কুদরত স্বীকার করতে শেখায়।
- তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে অপরাধবোধ হ্রাস পায় এবং আত্মতৃপ্তি জন্মায়।

**৫. প্রকৃত সুখের পথ: বাহ্যিক নয়, আত্মিক**

বস্তুগত সুখ ক্ষণস্থায়ী; আত্মিক সুখ স্থায়ী।আত্মশুদ্ধি মানুষকে এমন এক শান্তির স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে দুনিয়ার পরিবর্তনেও অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট হয় না।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তীব্র কষ্টের মধ্যেও বলতেন —

**"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর বিধানে সন্তুষ্ট, সে-ই প্রকৃত ধনী।"— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫১**

অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি মানুষকে সন্তুষ্টি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ করে — আর সেখান থেকেই আসে প্রকৃত সুখ।

**উপসংহার**

আত্মশুদ্ধি কেবল ইবাদতের বিষয় নয়, এটি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহর স্মরণে নিজেকে যুক্ত রাখে, সে দুঃখের মাঝেও শান্তি খুঁজে পায়, কারণ তার সুখ নির্ভর করে না দুনিয়ার অবস্থার উপর, বরং আত্মার শান্তির উপর।এই আত্মিক প্রশান্তিই মানুষের জীবনে প্রকৃত সুখের প্রতীক।

কুরআন বলছে, **"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে চলো, তিনি তোমাতে সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।" — সূরা আল-ফজর: ২৭–২৮**

৮.৫ ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্য আলিমদের মতামত

আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নফস ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।ইতিহাসে বহু আলিম ও সুফি চিন্তাবিদ এই বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন।তাদের মধ্যে ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (রহ.)-এর অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।তাঁর রচনা ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ইসলামী আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিশুদ্ধতার এক অনন্য দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

**১. ইমাম গাজ্জালীর মতে আত্মশুদ্ধির মূল লক্ষ্য**

ইমাম গাজ্জালী বলেন—

**"আত্মশুদ্ধি হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তার হৃদয়কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুক্ত করে ফেলে।" (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, খণ্ড: ৩, অধ্যায়: কিতাব রিয়াজাতুন নফস)**

তাঁর মতে, আত্মশুদ্ধি হল নফস আম্মারাহ (অপকর্মপ্রবণ আত্মা) থেকে নফস মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা)-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়া।এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, কারণ প্রকৃত সুখ কেবল তাঁর সন্তুষ্টিতেই নিহিত।

তিনি আত্মশুদ্ধির তিনটি ধাপ বর্ণনা করেছেন —

1. **তালিম (জ্ঞান অর্জন):** মানুষ প্রথমে নিজের দুর্বলতা ও পাপসমূহ চিনবে।
2. **তাজকিয়া (পরিশুদ্ধি):** অন্তরের রোগসমূহ (হিংসা, লোভ, অহংকার) দূর করবে।
3. **তাহলিয়া (আত্মা অলঙ্করণ):** আত্মাকে ঈমান, তাকওয়া, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুল দ্বারা সুন্দর করবে।

ইমাম গাজ্জালী মনে করেন — এই তিন ধাপ পূর্ণ হলে মানুষ সত্যিকার অর্থে আত্মশুদ্ধি লাভ করে, এবং তবেই আসে অন্তরের প্রশান্তি ও সুখ।

### ২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতামত

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে বলেছেন —"আত্মশুদ্ধি হলো আল্লাহর নৈকট্যের পথ। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে না, সে কখনোই প্রশান্তি পায় না।"

তিনি আত্মশুদ্ধির দুটি দিকের কথা বলেছেন —

নেগেটিভ দিক: অন্তর থেকে গুনাহ ও নফসের খারাপ প্রবণতাকে দূর করা।

পজিটিভ দিক: আত্মাকে ভালো গুণাবলিতে ভরিয়ে তোলা যেমন ধৈর্য, দয়া, বিনয়, এবং আল্লাহর ভালোবাসা।

তাঁর মতে, আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত সুখ নয়, বরং সমাজিক শান্তিরও ভিত্তি, কারণ শুদ্ধ আত্মা সমাজে ন্যায়, দয়া ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেয়।

### ৩. ইমাম ইবন তাইমিয়্যা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইবন তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন—

**"আত্মশুদ্ধি হলো ইলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম)-এর সমন্বিত রূপ। জ্ঞান ছাড়া আত্মশুদ্ধি বিভ্রান্তি, আর আমল ছাড়া আত্মশুদ্ধি অসম্পূর্ণ।" (মাজমু' আল-ফাতাওয়া, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৮৫)**

তিনি জোর দিয়েছেন এই কথায় যে, প্রকৃত আত্মশুদ্ধি হলো আল্লাহর বিধান মানা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্তরে খোদাভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি করা।এটি কেবল ধ্যান বা সন্ন্যাস নয়, বরং বাস্তব জীবনে নৈতিক আচরণের প্রতিফলন।

### ৪. সুফি চিন্তায় আত্মশুদ্ধি ও সুখ

সুফি আলিমরা আত্মশুদ্ধিকে "আল্লাহর সঙ্গে সংযোগের পথ" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।তাদের মতে, আত্মা যখন আল্লাহর স্মরণে লীন হয়, তখন পার্থিব কষ্টও

প্রশান্তিতে রূপ নেয়।হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বলেন — "যে আত্মা আল্লাহর ভালোবাসায় ডুবে যায়, সে কখনো দুঃখে ভেঙে পড়ে না।"

অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি কেবল পাপ থেকে মুক্তির পথ নয়; বরং এটি এমন এক অন্তরযাত্রা যা মানুষকে চিরস্থায়ী আনন্দের দিকে নিয়ে যায়।

**৫. ইসলামী চিন্তায় আত্মশুদ্ধি ও প্রকৃত সুখের যোগসূত্র**

ইমামগণ একমত যে, আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত সুখ অসম্ভব।

ইমাম গাজ্জালী বলেন: "যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে সুখ পায় না।"

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "আল্লাহর সন্তুষ্টিই আত্মার সুখের চাবিকাঠি।"

ইবন তাইমিয়্যা বলেন: "আমার জান্নাত আমার বুকে; যে আমাকে বন্দি করবে, সে আমার জান্নাত কেড়ে নিতে পারবে না।"তাঁর এই উক্তি বোঝায় যে প্রকৃত সুখ বা জান্নাত হলো বাহিরে নয়, বরং অন্তরে — আত্মশুদ্ধ হৃদয়ে।

**উপসংহার**

ইমাম গাজ্জালী ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, আত্মশুদ্ধি হলো প্রকৃত সুখের কেন্দ্রবিন্দু।আত্মাকে যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করা যায়, তাহলে বাহ্যিক দুঃখও প্রশান্তিতে পরিণত হয়।ইসলামী চিন্তাধারায় সুখ মানে ভোগ নয়, বরং আত্মার শান্তি — আর সেই শান্তি অর্জিত হয় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, যেমন আল্লাহ বলেনঃ

**"নিশ্চয়ই সফল সে ব্যক্তি, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।"— সূরা আশ-শামস: ৯**

## অধ্যায় ৯: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৯.১ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামের সুখ ধারণা

**ভূমিকা**

মানুষের সুখ অন্বেষণ মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অনুসন্ধানগুলোর একটি। কিন্তু "সুখ" বলতে কী বোঝানো হয় — এ প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে সভ্যতা ও দর্শনের ভিত্তিতে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সুখকে মূলত মানসিক তৃপ্তি, ভোগের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সাফল্যের ফল হিসেবে দেখে, যেখানে ইসলাম সুখকে দেখে আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ফল হিসেবে। এই পার্থক্য শুধু

ধারণাগত নয়, বরং মানুষের জীবনবোধ, সমাজনীতি, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার ধরনেও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

**১. পাশ্চাত্য সভ্যতায় সুখের ধারণা**

**(ক) দার্শনিক দৃষ্টিকোণ**

পাশ্চাত্যের প্রাচীন দার্শনিকেরা যেমন এরিস্টটল, এপিকিউরাস ও স্টোয়িকরা, সুখকে ব্যাখ্যা করেছেন "মানুষের পার্থিব জীবনের পরিপূর্ণতা" হিসেবে।

এরিস্টটল বলেছিলেন, সুখ (Eudaimonia) অর্জিত হয় নৈতিক গুণাবলি চর্চা ও যুক্তিসম্মত জীবনযাপনের মাধ্যমে, তবে তাঁর সুখের ধারণা ছিল মূলত পৃথিবীমুখী।

এপিকিউরাস সুখকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও ভোগের পরিমিত আনন্দ হিসেবে।

স্টোয়িকরা বলেছিলেন, প্রকৃত সুখ আসে নিয়ন্ত্রণ ও যুক্তির মধ্যে থেকে, কিন্তু তবুও তারা পার্থিব বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেননি।

**(খ) আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা**

আধুনিক কালে, পাশ্চাত্য সমাজ সুখকে দেখছে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সমষ্টি হিসেবে।ক্যাপিটালিস্ট দর্শনের প্রভাবে "সুখ" মানে হলো ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি ও বস্তুগত উন্নয়ন।মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড সুখকে ব্যাখ্যা করেছেন "আকাঙ্ক্ষা পূরণের সন্তুষ্টি" হিসেবে।

পজিটিভ সাইকোলজি (Positive Psychology) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন সেলিগম্যান বলেন, সুখ আসে "আনন্দ, সম্পৃক্ততা ও অর্থপূর্ণ কাজের সংমিশ্রণ" থেকে — কিন্তু এখানেও "ঈশ্বর বা আখিরাত" ধারণা অনুপস্থিত।

**(গ) ফলাফল**

এই বস্তুবাদী সুখ ধারণা সমাজে অন্তহীন প্রতিযোগিতা, মানসিক চাপ, একাকীত্ব ও আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়িয়েছে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক উন্নত দেশগুলোতেও মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে বিষণ্নতা ও মানসিক শূন্যতায় ভুগছে।

**২. ইসলামী দৃষ্টিতে সুখের ধারণা**

**(ক) আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিহিত সুখ**

ইসলাম বলে, প্রকৃত সুখ হলো আত্মার শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

**“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে পুরুষ হোক বা নারী — আর সে মুমিন হলে — আমি তাকে পরম সুখময় জীবন দান করব।”(সূরা আন-নাহল: ৯৭)**

এ আয়াত দেখায়, সুখ কোনো বাহ্যিক অর্জন নয়; বরং তা হৃদয়ের প্রশান্তি, যা ঈমান, তাকওয়া ও আমলের ফল।

**(খ) আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর স্মরণ**

ইসলাম বলে —**“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা আর-রাদ: ২৮)**

অর্থাৎ, সুখ মানে আত্মার প্রশান্তি; যা অর্জিত হয় যখন মানুষ নিজের কামনা-বাসনা সংযত করে আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করে।

**(গ) দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য**

ইসলাম কখনোই দুনিয়াবিমুখতা শেখায় না; বরং শেখায় ভারসাম্য।

**“তুমি তোমার পরকালকেও ভুলে যেও না, আর দুনিয়ার অংশ থেকেও প্রাপ্যটুকু গ্রহণ কর।”(সূরা আল-কাসাস: ৭৭)**

অতএব, ইসলামে সুখ মানে শুধু ভোগ নয়, বরং দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আখিরাতের প্রস্তুতি।

**(ঘ) নবী ﷺ এর দৃষ্টিতে সুখ**

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**“যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করেছে, পর্যাপ্ত জীবিকা পেয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট, সে-ই সফল।” (সহীহ মুসলিম)**

অর্থাৎ, সুখ হলো সন্তুষ্টি (কানাআহ) — যা আল্লাহর প্রদত্ত জীবনে তুষ্ট থাকার মাধ্যমে আসে, না যে জিনিস অর্জনের মাধ্যমে।

**৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

পাশ্চাত্য ও ইসলামী সুখ ধারণার মধ্যে মূল পার্থক্য নিহিত রয়েছে “সুখের উৎস” ও “লক্ষ্য” সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সুখকে দেখে বাহ্যিক অর্জনের ফল হিসেবে — যেমন অর্থ, ভোগ, সামাজিক মর্যাদা বা ক্ষমতার অধিকার। সেখানে মানুষ যত বেশি ভোগ করতে পারে, ততই তাকে সুখী মনে করা হয়। পাশ্চাত্যের এই ধারণায় সুখের মাপকাঠি হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও পার্থিব সফলতা।

অন্যদিকে, ইসলামে সুখের মূল উৎস হলো আত্মিক প্রশান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইসলাম শেখায়, প্রকৃত সুখ দুনিয়ার জিনিসে নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তিতে নিহিত। যেমন আল্লাহ বলেন — “জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা রা’দ, আয়াত

২৮)। অর্থাৎ, সুখ একটি আত্মিক অবস্থা, যা বাহ্যিক অর্জন দ্বারা নয় বরং অন্তরের ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

পাশ্চাত্য চিন্তায় সুখ মূলত ব্যক্তিনির্ভর ও স্বার্থকেন্দ্রিক, কিন্তু ইসলামে সুখ সমষ্টিনির্ভর ও নৈতিক। ইসলাম ব্যক্তি সুখের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণকেও গুরুত্ব দেয়। যেমন, যাকাত, সদকা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণিকে সাহায্য করা — এটিও ইসলামের চোখে সুখের অংশ, কারণ এতে অন্তর প্রশান্ত হয় এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্য সুখ ধারণা শুধুমাত্র এই দুনিয়াকেন্দ্রিক, অর্থাৎ সুখের শেষ সীমা হলো পার্থিব জীবনেই। কিন্তু ইসলামে সুখ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। ইসলাম মানুষকে শেখায় — "তুমি তোমার পরকালকেও ভুলে যেও না, আর দুনিয়ার অংশ থেকেও প্রাপ্যটুকু গ্রহণ কর।" (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৭৭)।

এছাড়া পাশ্চাত্য সুখের ধারণা ক্রমে মানসিক অস্থিরতা, প্রতিযোগিতা ও একাকীত্বের জন্ম দিয়েছে, যেখানে মানুষ যতই ভোগ করছে, ততই শূন্যতা অনুভব করছে। কিন্তু ইসলামের সুখ ধারণা শান্তি, তৃপ্তি ও ভারসাম্যের দিকে আহ্বান জানায়, যা দুনিয়া ও পরকাল উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, পাশ্চাত্য সুখের ধারণা বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী — যা নির্ভর করে পার্থিব অর্জনের উপর; কিন্তু ইসলামী সুখ ধারণা অভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী — যা নির্ভর করে আত্মশুদ্ধি, ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর। পাশ্চাত্যে সুখ মানে অর্জনের পরিতৃপ্তি, আর ইসলামে সুখ মানে আত্মার প্রশান্তি ও আখিরাতের সফলতা।

**৪. উপসংহার**

পাশ্চাত্য সুখ ধারণা মূলত বহির্মুখী, আর ইসলামের সুখ ধারণা অন্তর্মুখী ও আল্লাহমুখী।পাশ্চাত্য সমাজে সুখ ক্ষণস্থায়ী ও বাহ্যিক, যা নির্ভর করে অবস্থার পরিবর্তনের ওপর; কিন্তু ইসলামে সুখ চিরস্থায়ী ও অন্তরের, যা অর্জিত হয় আত্মশুদ্ধি, ঈমান ও আল্লাহর স্মরণে।

অতএব, কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে বলা যায় — প্রকৃত সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তি, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈতিক জীবনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সুখ বা "হ্যাপিনেস" একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র। পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানীরা সুখকে ব্যাখ্যা করেন মূলত মানসিক সন্তুষ্টি, ইতিবাচক আবেগ ও জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব হিসেবে। অন্যদিকে, ইসলামী আত্মশিক্ষা বা তাযকিয়াতুন নফস সুখকে দেখে আত্মার পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ফল হিসেবে। দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু মিল থাকলেও, মূল ভিত্তি ও উদ্দেশ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

**১। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সুখ ধারণা:**

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সুখকে সাধারণত তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় —

**হেডোনিক সুখ** (Hedonic Happiness): যেখানে সুখ মানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতি। যেমন খাবার, বিনোদন, সাফল্য বা সম্পর্ক থেকে পাওয়া সুখ।

**ইউডাইমনিক সুখ** (Eudaimonic Happiness): যেখানে সুখ মানে জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া, নিজের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো ও অর্থবহ জীবনযাপন।

**সাবজেকটিভ ওয়েল-বিয়িং** (Subjective Well-being): এটি সুখের একটি মানসিক সূচক, যেখানে নিজের জীবনের প্রতি সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপ করা হয়।

এই তত্ত্বগুলোতে সুখের উৎস মানুষ নিজেই — তার চিন্তা, আচরণ, অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক। কিন্তু এখানে আত্মার কোনো আধ্যাত্মিক মাত্রা ধরা হয় না। ফলে এই সুখ প্রায়ই অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও ভোগনির্ভর হয়ে পড়ে।

**২। ইসলামী আত্মশিক্ষা (তাযকিয়াতুন নফস)-এর সুখ ধারণা:**

ইসলামে "তাযকিয়া" অর্থ পরিশুদ্ধি বা পরিশোধন, বিশেষ করে আত্মার। আল্লাহ বলেন —

**"যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে; আর যে একে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।" (সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯-১০)**ইসলামী দৃষ্টিতে সুখ হলো অন্তরের প্রশান্তি (সকিনা), যা পাওয়া যায় আল্লাহর স্মরণ, সৎকর্ম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। এটি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখ নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তির এক অবস্থা, যেখানে মানুষ নিজের স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বোচ্চ স্থানে রাখে।

তাযকিয়া প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর রয়েছে—

1. **নফসে আম্মারা (প্ররোচনাকারী আত্মা)** – যেখানে মানুষ খারাপ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

2. **নফসে লাওয়ামা (আত্ম-সমালোচনাকারী আত্মা)** – যেখানে মানুষ নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে।

3. **নফসে মুতমাইন্না (শান্ত আত্মা)** – যেখানে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। তৃতীয় স্তরেই প্রকৃত সুখ নিহিত — যেমন আল্লাহ বলেন,

**"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট হয়ে ও সন্তুষ্টি অর্জন করে।" (সূরা আল-ফজর, আয়াত ২৭-২৮)**

**৩। মূল পার্থক্য:**

মনোবিজ্ঞান সুখকে ব্যাখ্যা করে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে।ইসলাম ব্যাখ্যা করে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে। মনোবিজ্ঞানে সুখ মানে মানসিক ভারসাম্য ও ইতিবাচক চিন্তা; ইসলামে সুখ মানে আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উৎকর্ষ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সুখের কৌশল হিসেবে বলে—ইতিবাচক চিন্তা করা,কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,লক্ষ্য নির্ধারণ,ভালো সম্পর্ক গড়া।ইসলামও এগুলোর প্রতি উৎসাহ দেয়, তবে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে — যেমন কৃতজ্ঞতা (শুকর) আল্লাহর প্রতি, লক্ষ্য নির্ধারণ আখিরাতের সফলতার জন্য, সম্পর্ক গড়া সমাজে কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ ইসলামের সুখ ধারণা মানুষের জীবনের সকল দিককে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে।

**৪। উপসংহার:**

মনোবিজ্ঞান সুখকে সাময়িক মানসিক প্রশান্তি হিসেবে দেখে, কিন্তু ইসলাম একে চিরস্থায়ী আত্মিক প্রশান্তির ফল বলে। মনোবিজ্ঞানের সুখ নির্ভর করে নিজের মনোভাবের উপর, কিন্তু ইসলামের সুখ নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মার পরিশুদ্ধির উপর। ইসলামী আত্মশিক্ষা তাই শুধু মানসিক প্রশান্তিই দেয় না, বরং নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আখিরাতমুখী জীবনদৃষ্টিও তৈরি করে — যা মানুষের প্রকৃত ও স্থায়ী সুখের ভিত্তি।

### ৯.৩ ইসলামী সুখ ধারণার সার্বজনীনতা

ইসলামের সুখ ধারণা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি সার্বজনীন ও কালজয়ী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। কারণ ইসলাম মানুষের প্রকৃতি (fitrah) অনুযায়ী সুখের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে—যা প্রতিটি যুগে, প্রতিটি সমাজে, প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত সুখ (sa'adah) হলো এমন এক অন্তর্দশা, যা আসে আত্মিক পরিশুদ্ধি, নৈতিক শুদ্ধতা, সৎকর্ম, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। এই সুখ কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, বা সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা মানুষের অন্তরের গভীর তৃপ্তি ও শান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা প্রতিটি মানুষেরই চাওয়া।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

**"যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী—আর সে ঈমানদার হয়—আমি তাকে দুনিয়ায় কল্যাণকর জীবন দান করব এবং পরকালে উত্তম প্রতিদান দেব।" (সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭)**

এই আয়াত ইসলামী সুখ ধারণার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সুখ এখানে কোনো জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে কেউ ঈমান ও সৎকর্মের পথে চলবে, সে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় সুখ প্রায়ই সাংস্কৃতিক, সামাজিক বা আর্থিক প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত হয়। ধনী দেশের সুখের সংজ্ঞা দরিদ্র দেশের সুখের সংজ্ঞার থেকে আলাদা হতে পারে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে সুখের ভিত্তি এক ও অভিন্ন—আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈতিক জীবনযাপন। এই কারণেই ইসলামী সুখ ধারণা সময়, সমাজ বা জাতির সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন হয়ে ওঠে।

ইসলামী সুখ ধারণা মানুষের জীবনের সকল দিককে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক দিকেই নয়, বরং শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক দিকেও সুখের পরিপূর্ণতা কামনা করে। যেমন—

- আত্মিকভাবে সুখ আসে ঈমান, নামাজ, রোজা ও আল্লাহর স্মরণে।
- মানসিকভাবে সুখ আসে তওবা, কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির চর্চা থেকে।
- সামাজিকভাবে সুখ আসে ন্যায়বিচার, দান, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

**"সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থেকেছে এবং যার রিজিক আল্লাহ পরিমিতভাবে দিয়েছেন।" (সহিহ মুসলিম)**

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়—ইসলামী সুখ কোনো বাহ্যিক সাফল্য বা সম্পদের ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির ওপর। ফলে, এক দরিদ্র মানুষও ইসলামী অর্থে সুখী হতে পারে, যদি তার অন্তরে থাকে ঈমান, তৃপ্তি ও আত্মশুদ্ধি।

ইসলামী সুখ ধারণা বিশ্বজনীন এই অর্থে যে, এটি মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ, সে যে সংস্কৃতিরই হোক না কেন, অন্তরে শান্তি ও স্থিতি চায়—এবং ইসলাম সেই শান্তির উৎসকে চিহ্নিত করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে (Islam শব্দটিরই অর্থ "আত্মসমর্পণ ও শান্তি")।

অতএব, ইসলামের সুখ ধারণা এমন এক দর্শন যা জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা যুগের পার্থক্য ছাড়িয়ে মানবতার মূল চাহিদাকে স্পর্শ করে। এটি শেখায় যে প্রকৃত সুখ আসে বাহ্যিক অর্জন নয়, বরং অন্তরের তৃপ্তি, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে।

### ৯.৪ বস্তুবাদ বনাম আধ্যাত্মিকতা

আধুনিক সভ্যতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, সুখকে বস্তুগত অর্জনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করেছে। অর্থ, বিলাসিতা, প্রযুক্তি, নাম-যশ ও সামাজিক অবস্থান—এইগুলোই আজকের সমাজে "সফলতা" ও "সুখ"-এর মানদণ্ড। কিন্তু ইসলাম সুখকে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে—যেখানে মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি (Spiritual Tranquility), যা আসে আল্লাহর স্মরণ, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক জীবনের মাধ্যমে।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত গভীর এবং মানবজীবনের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। নিচে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

**১. বস্তুবাদের ধারণা ও তার সীমাবদ্ধতা**

বস্তুবাদ (Materialism) হলো এমন এক জীবনদর্শন, যেখানে সুখকে মাপা হয় বস্তুগত অর্জন—যেমন অর্থ, সম্পদ, পদ, নাম ও খ্যাতির মাধ্যমে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে "সফল মানুষ" বলতে বোঝানো হয় যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল, বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন, উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করেন এবং সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে আছেন। তবে এই বস্তুগত অগ্রগতি মানুষকে যে সুখ দেবে, তা প্রমাণিত হয়নি। বরং বাস্তবে দেখা গেছে—

ধনী সমাজগুলোতেও মানসিক অবসাদ, একাকীত্ব ও আত্মহত্যার হার বেড়ে যাচ্ছে।প্রযুক্তি ও ভোগবিলাস বাড়লেও অন্তরের শান্তি ও মানবিক বন্ধন ক্রমশ কমে যাচ্ছে।মানুষ ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক, প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও উদাসীন হয়ে পড়ছে, যার ফলস্বরূপ সমাজে বিভাজন, হিংসা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুরআন এই মানসিক অবস্থাকে ইঙ্গিত করে বলেছে—

**"যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য সংকীর্ণ জীবন নির্ধারণ করি।" (সূরা ত্বাহা ২০:১২৪)**

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে—আল্লাহর স্মরণ ছাড়া মানুষের জীবন, যতই বিলাসবহুল হোক না কেন, তা হবে সংকীর্ণ, অশান্ত ও অপূর্ণ।

## ২. ইসলামের আধ্যাত্মিক সুখের ধারণা

ইসলাম বলে—সুখ কোনো বস্তু নয়, বরং এটি এক অন্তর্গত অবস্থা। এই সুখ আসে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া, কৃতজ্ঞতা, ও আল্লাহর নিকটবর্তীতা থেকে।ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কেবল দেহ নয়, বরং দেহ ও আত্মা—দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত। তাই আত্মার যত্ন ছাড়া সুখ কখনো পূর্ণ হতে পারে না। যেমন দেহ ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি আত্মাও আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—**"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" (সূরা রা'দ ১৩:২৮)**এই আয়াত প্রমাণ করে, প্রকৃত সুখ মানুষের অন্তরের গভীরে নিহিত, যা কোনো বাহ্যিক সম্পদে পাওয়া যায় না।

## ৩. বস্তুবাদ বনাম আধ্যাত্মিকতার ফলাফল

বস্তুবাদী জীবন: সাময়িক আনন্দ, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে শূন্যতা, উদ্বেগ ও অর্থহীনতার বোধ।
আধ্যাত্মিক জীবন: বাহ্যিক দারিদ্র্য থাকলেও অন্তরে প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও আল্লাহর নৈকট্যের সুখ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—**"ধনসম্পদের প্রাচুর্যে নয়, প্রকৃত সমৃদ্ধি হলো অন্তরের সমৃদ্ধি।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)**

অর্থাৎ, প্রকৃত সুখ সেই ব্যক্তির, যার অন্তর সন্তুষ্ট, কৃতজ্ঞ, এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

## ৪. ইসলামী ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম বস্তুবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে না; বরং ভারসাম্য শেখায়। ইসলাম বলে—দুনিয়ার রিজিক ও ভোগ উপভোগ করা হারাম নয়, বরং আল্লাহর নিয়ামতের অংশ।তবে সেই ভোগ যেন মানুষকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে, অহংকারে না ডুবায়, এবং অন্যের অধিকার হরণ না করে।

কুরআনে বলা হয়েছে— **"তুমি যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা পরকাল কামনা করো, আর দুনিয়ার অংশও ভুলে যেও না।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:৭৭)**

এই আয়াতই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সুখ ধারণাকে প্রকাশ করে—দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সমন্বয়ই প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি।

## ৫. উপসংহার

বস্তুবাদ সুখের এক অস্থায়ী ও বাহ্যিক রূপ দেয়, যা মানুষের অন্তরকে পূর্ণতা দিতে ব্যর্থ। আধ্যাত্মিকতা, বিশেষত ইসলামী আধ্যাত্মিকতা, মানুষকে দেয় স্থায়ী প্রশান্তি, কৃতজ্ঞতা ও জীবনের উদ্দেশ্যবোধ।

অতএব, ইসলাম শেখায়—প্রকৃত সুখ মানে "বেশি পাওয়া" নয়, বরং "যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা" এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে জীবনযাপন করা।

### ৯.৫ সুখের মডেল বনাম সেকুলার সুখের মডেল

সুখের ধারণা মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক অনুসন্ধান। তবে "সুখ" শব্দটির অর্থ ও উৎস সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারা এবং সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একদিকে সেকুলার সুখ মডেল সুখকে ব্যাখ্যা করে মনস্তাত্ত্বিক, বস্তুগত ও সামাজিক পরিপূর্ণতা হিসেবে, অপরদিকে ইসলামী সুখ মডেল সুখকে দেখে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পরকালমুখী প্রশান্তির আলোকে। নিচে উভয় মডেলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো।

### ১. সুখের উৎসের দৃষ্টিভঙ্গি

**সেকুলার মডেল:**

সেকুলার বা আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সুখকে সংজ্ঞায়িত করে ব্যক্তিগত আনন্দ, আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা এবং মানসিক স্বস্তি হিসেবে। এখানে সুখের উৎস বাহ্যিক—অর্থাৎ সমাজ, সম্পর্ক, পেশা ও বস্তুগত অর্জন। এই ধারণা মানুষের জীবনকে পরিমাপ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত সফলতার মাধ্যমে।

**ইসলামী মডেল:**

ইসলাম বলে, সুখের মূল উৎস হলো আল্লাহর স্মরণ, তাকওয়া, এবং নৈতিক শুদ্ধতা। সুখ আসে অন্তর থেকে, বাহির থেকে নয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

**"যে সৎকর্ম করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আর সে ঈমানদার হলে—আমি তাকে দেব এক পরম সুন্দর জীবন।" (সূরা আন-নাহল ১৬:৯৭)**

এখানে "পরম সুন্দর জীবন" বলতে বোঝানো হয়েছে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও অন্তরের শান্তি—যা বাহ্যিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে স্থায়ী।

### ২. জীবনের উদ্দেশ্য

**সেকুলার সুখ মডেল:**

এই মডেলে জীবনের উদ্দেশ্য হলো নিজের সম্ভাবনা পূর্ণ করা, সর্বোচ্চ আনন্দ পাওয়া, ও দুঃখ কমানো। অর্থাৎ, মানুষ নিজের জন্যই বাঁচে, তার জীবনের লক্ষ্য আত্মকেন্দ্রিক। এই ধারণা হেডোনিজম (hedonism) এবং ইউটিলিটারিয়ানিজম (utilitarianism)-এর মতো দর্শনের ওপর ভিত্তি করে।

**ইসলামী সুখ মডেল:**

ইসলাম শেখায় যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। **"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।"(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)** অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে সুখের পথ হলো আল্লাহর আনুগত্য, আত্মশুদ্ধি ও সৎকর্ম—যা দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ী আনন্দ দেয়।

**৩. সুখের স্থায়িত্ব**

**সেকুলার সুখ:**

সেকুলার সুখ সাময়িক। এটি পরিবেশ, অর্থনীতি বা সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে হারিয়ে যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটাকে বলে "hedonic treadmill"—যেখানে মানুষ যত কিছুই পায়, কিছু সময় পর তা স্বাভাবিক মনে হয় এবং সে আরও চায়। ফলস্বরূপ, সে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না।

**ইসলামী সুখ:**

ইসলামী সুখ স্থায়ী, কারণ এটি নির্ভর করে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ওপর, যা কখনো পরিবর্তনশীল নয়।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—**"ধনসম্পদের প্রাচুর্য নয়, বরং অন্তরের প্রশান্তিই প্রকৃত সম্পদ।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)**ইসলামী সুখ তাই বাহ্যিক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ এবং চিরস্থায়ী।

**৪. সমাজে সুখের প্রতিফলন**

**সেকুলার সমাজ:**

সুখকে এখানে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা হয়—"আমার সুখ, আমার পছন্দ।" এই ধারণা সমাজে স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে একাকীত্ব ও মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যায়।

**ইসলামী সমাজ:**

ইসলাম বলে—প্রকৃত সুখ কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত।প্রতিবেশীর সুখে অংশ নেওয়া,দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো,সমাজে ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা—এসবই

ইসলামী সুখের অপরিহার্য অংশ। কুরআনে বলা হয়েছে— **"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা মায়িদা ৫:২)**

**৫. সুখ ও পরকাল**

**সেকুলার মডেল:**

এখানে সুখের সীমা পৃথিবীতেই শেষ। মৃত্যুর পর কী হবে তা এই মডেল বিবেচনা করে না। তাই এই চিন্তায় মানুষ মৃত্যুভয়, অনিশ্চয়তা ও মানসিক শূন্যতায় ভোগে।

**ইসলামী মডেল:**

ইসলামে সুখ দ্বৈত—দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

**"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও ভালো দাও, আখিরাতেও ভালো দাও, এবং আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"(সূরা বাকারা ২:২০১)**

এই দোয়া ইসলামী সুখ ধারণার সারমর্ম—যেখানে পার্থিব কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি একসঙ্গে কামনা করা হয়।

**৬. উপসংহার**

ইসলামী সুখের মডেল মানুষের আত্মা, সমাজ ও স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে; অন্যদিকে সেকুলার সুখের মডেল সীমাবদ্ধ শরীর, ভোগ ও ব্যক্তিস্বার্থে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে প্রকৃত সুখ হলো—আত্মিক শান্তি,আল্লাহর সন্তুষ্টি,এবং আখিরাতে মুক্তি।

অতএব, ইসলাম এমন একটি সর্বজনীন সুখ মডেল উপস্থাপন করে যা মানবজীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, পার্থিব ও পরকালীন—উভয় দিককে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করে।

**তুলনামূলক সারসংক্ষেপ ও উপসংহার**

সুখের অনুসন্ধান মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক প্রাচীন ও সর্বজনীন এক আকাঙ্ক্ষা। তবে ইসলামী সুখের মডেল এবং সেকুলার সুখের মডেল—এই দুই ধারণার মধ্যে মূল পার্থক্য নিহিত আছে সুখের উৎস, উদ্দেশ্য ও স্থায়িত্ব-এর ব্যাখ্যায়।

**১. সুখের উৎসে পার্থক্য**

সেকুলার চিন্তায় সুখ আসে বাহ্যিক জগৎ থেকে—অর্থ, ভোগবিলাস, সফলতা ও ইন্দ্রিয়সুখের মাধ্যমে। অন্যদিকে, ইসলামী দৃষ্টিকোণে সুখের উৎস অন্তরে, যা আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাকওয়া, ও আত্মশুদ্ধির ফসল।]**"যে আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে, তার অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা রা'দ ১৩:২৮)**

অতএব, ইসলাম শেখায় যে প্রকৃত সুখ বাহিরে নয়, বরং অন্তরে নিহিত; এবং তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমেই অর্জনযোগ্য।

**২. জীবনের উদ্দেশ্যে পার্থক্য**

সেকুলার সুখের ধারণায় মানুষ নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাঁচে—এখানে সুখ মানে 'আমি যা চাই তা পাওয়া'।কিন্তু ইসলামে মানুষ বাঁচে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের জন্য; সুখ মানে 'আমি যা করি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য'।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে ঈমান, ইহসান ও নৈতিক দায়িত্বের পথে নিয়ে যায়।

**৩. সুখের স্থায়িত্বে পার্থক্য**

সেকুলার সুখ সাময়িক ও পরিবর্তনশীল। আধুনিক সমাজে অর্থ, খ্যাতি বা ভোগ—সবই কিছু সময় পর হারিয়ে যায়। এর ফলে মানুষ মানসিক চাপ, বিষণ্নতা ও একাকীত্বে ভোগে।অন্যদিকে, ইসলামী সুখ স্থায়ী, কারণ এটি আত্মা ও স্রষ্টার বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

**"প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি, যার অন্তর আল্লাহর দেওয়াতে সন্তুষ্ট।"(সহিহ বুখারি, হাদীস ৬৪৪৬)**

**৪. সামাজিক সুখের দৃষ্টিকোণে পার্থক্য**

সেকুলার সুখ ব্যক্তিগত, প্রতিযোগিতামূলক ও স্বার্থনির্ভর। সমাজে একে অপরের সুখে অংশ নেওয়ার তেমন গুরুত্ব নেই।ইসলামী সুখ সমাজভিত্তিক—এখানে ভ্রাতৃত্ব, দয়া, যাকাত, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রকৃত সুখের অপরিহার্য উপাদান।

**"তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা চায়, তা তার ভাইয়ের জন্যও না চায়।"(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)**

**৫. সুখের পরকালীন দৃষ্টিভঙ্গি**

সেকুলার সুখ পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ; মৃত্যুর পরের জীবনের কোনো স্থান নেই।ইসলামী সুখ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

**"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও ভালো দাও, আখিরাতেও ভালো দাও।"(সূরা বাকারা ২:২০১)**

এখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুখ ধারণা দেয়—যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

**উপসংহার**

সবশেষে বলা যায়, ইসলাম সুখকে একটি সমন্বিত, চিরস্থায়ী ও নৈতিক ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, যা শুধু ব্যক্তিগত প্রশান্তি নয় বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।সেকুলার দৃষ্টিতে সুখ একটি ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি,

আর ইসলামী দৃষ্টিতে সুখ একটি চিরস্থায়ী অবস্থান—যা শুরু হয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং পরিপূর্ণতা পায় আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্তির মাধ্যমে।

## অধ্যায় ১০: উপসংহার ও সুপারিশ

মূল বক্তব্য: প্রকৃত সুখ = আল্লাহর স্মরণ ও তাকওয়া

এই গবেষণার সারমর্মে দেখা যায় যে, মানুষের প্রকৃত সুখ কোনো বস্তুগত অর্জনে নয়, বরং আল্লাহর স্মরণ (যিকর) ও তাকওয়ায় নিহিত। কোরআন ও হাদীসের আলোকে মানবজীবনের শান্তি ও সন্তুষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইরশাদ করেন:

**“যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে, জেনে রাখো — আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”(সূরা আর-রা’দ, ১৩:২৮)**

এই আয়াত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, অন্তরের শান্তি ও সুখের একমাত্র উৎস আল্লাহর স্মরণ। অর্থ, খ্যাতি, সম্পদ কিংবা ক্ষমতা মানুষকে অল্প সময়ের জন্য আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী প্রশান্তি এনে দিতে পারে না। যতই মানুষ বাহ্যিক সাফল্য অর্জন করুক, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার অন্তর শূন্য ও অস্থির হয়ে পড়ে।

তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি, ঈমান ও নৈতিক সচেতনতা মানুষকে সব অনৈতিক প্রবৃত্তি, হিংসা, অহংকার, লোভ ও রিয়ার মতো অন্তরের রোগ থেকে মুক্ত করে। তাকওয়াবান ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেন। ফলে তার চিন্তা, কর্ম ও সম্পর্ক — সবকিছুই পরিমিত, ন্যায়ভিত্তিক ও সুশৃঙ্খল হয়।

ইসলাম শিখিয়েছে যে, প্রকৃত সুখ হলো এমন এক মানসিক অবস্থা যেখানে মানুষ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তাঁর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়। এই সুখ কেবল দুনিয়ার সাময়িক সাফল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই কল্যাণ নিশ্চিত করে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন:

**"সফল সেই ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যথেষ্ট রিযিক পেয়েছে এবং আল্লাহ তাকে তার দেয়া রিযিকে সন্তুষ্টি দিয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৫৪)**

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সন্তুষ্টি (কানাআত) ও আল্লাহর প্রতি ভরসা — এ দুটোই প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি। তাই ইসলামী দৃষ্টিতে সুখ মানে হলো না ধনসম্পদ বা বাহ্যিক অর্জন, বরং এক প্রশান্ত, ঈমানভিত্তিক ও তাকওয়ামূলক জীবনযাপন।

অতএব, বলা যায়—"প্রকৃত সুখ সেই অন্তরে, যা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত, তাকওয়ায় পরিপূর্ণ এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।"

**সারসংক্ষেপ**

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল — **"মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়: কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে"** — এই প্রশ্নের একটি স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত উত্তর খোঁজা। পুরো গবেষণার আলোচনায় দেখা যায়, আধুনিক যুগে সুখের ধারণা অনেকটাই বস্তুনির্ভর ও ক্ষণস্থায়ী। অর্থ, খ্যাতি, ভোগবিলাস, প্রযুক্তি ও ভৌত সাফল্যকে কেন্দ্র করেই আধুনিক মানুষ সুখ খোঁজে। কিন্তু এই বস্তুবাদী সুখ মানুষকে কেবল বাইরের জগতে ব্যস্ত রাখে, অন্তরের শান্তি ও স্থায়ী প্রশান্তি এনে দিতে পারে না। ফলে মানসিক অস্থিরতা, একাকিত্ব, উদ্বেগ ও হতাশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

অন্যদিকে, ইসলাম সুখকে কেবল ভোগ বা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং এটিকে একটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রকৃত সুখ হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, ন্যায়পরায়ণ, নৈতিক, পরোপকারী ও অন্তরে প্রশান্ত। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুখ অর্জনের প্রধান উপায় হলো আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর স্মরণ, নৈতিক জীবনযাপন, সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও দয়া ও ভ্রাতৃত্বের চর্চা।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, পাশ্চাত্যের সুখের ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যেখানে স্বাধীনতা, ভোগ ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামী সুখের ধারণা সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সমষ্টিমুখী। এতে ব্যক্তির পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও মানবতার কল্যাণকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইমাম গাজ্জালী, ইবনুল কাইয়্যিম ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, সুখ বা "সাআদাহ" কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈতিক পূর্ণতার মাধ্যমেই অর্জনযোগ্য। আত্মশুদ্ধি

(তাযকিয়াতুন নাফস) মানুষকে তার অন্তরের রোগ থেকে মুক্ত করে, ফলে অন্তরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি আসে, যা প্রকৃত সুখের প্রতীক।

সবশেষে বলা যায়, ইসলামী সুখের ধারণা কেবল আখিরাতমুখী নয়, বরং এটি দুনিয়াতেও শান্তি, ন্যায় ও মানবকল্যাণের একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করে। আধুনিক সমাজে এই ইসলামী সুখমডেল গ্রহণ করলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ — তিন স্তরেই প্রকৃত শান্তি ও স্থায়ী সুখ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

**সুপারিশ:**

এই গবেষণার আলোকে বোঝা যায়, মানুষের প্রকৃত সুখ কেবল তত্ত্ব বা চিন্তায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বাস্তব জীবনে ইসলামী নীতিমালা অনুসারে আচরণ ও জীবনযাপনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। নিচে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে সুখ অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দেওয়া হলো —

**১. ব্যক্তিগত জীবনে → ইবাদত ও কানাআত (সন্তুষ্টি)**

ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত সুখ অর্জনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। নিয়মিত সালাত, কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও যিকর মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি দেয় এবং মনকে পরিশুদ্ধ রাখে।

এছাড়া কানাআত, অর্থাৎ যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা, সুখের অন্যতম স্তম্ভ। আজকের ভোগবাদী সমাজে মানুষ ক্রমাগত তুলনা ও প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা শেখায় — প্রকৃত ধন-সম্পদ হলো অন্তরের প্রশান্তি।

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন:

**"ধন-সম্পদ অধিকতায় নয়; বরং প্রকৃত ধন হলো অন্তরের ধন।"(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৪৬)**

অতএব, ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হতে হলে ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে জাগ্রত করা ও কানাআতের মাধ্যমে হৃদয়কে পরিতৃপ্ত রাখা অপরিহার্য।

**২. পারিবারিক জীবনে → নৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্মান**

পরিবার ইসলামী সমাজের ভিত্তি। সুখী পরিবার ছাড়া সমাজে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়। কোরআন পরিবারকে "মওয়াদ্দাহ ও রহমাহ" (ভালোবাসা ও দয়া)-র উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, ধৈর্য, দয়া ও দায়িত্ববোধ থাকলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং তাতে প্রকৃত সুখের জন্ম হয়।তেমনি, সন্তানদের সঠিক

ইসলামি শিক্ষা প্রদান, পিতা-মাতার সেবা ও দোয়া গ্রহণ — এগুলোও পারিবারিক শান্তি ও আনন্দের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কোরআনে আল্লাহ বলেন:

**"আর তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"(সূরা নিসা, ৪:৩৬)**

যে পরিবারে ইসলামী নৈতিকতা ও পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকে, সেই পরিবারই হয় প্রকৃত সুখের আশ্রয়স্থল।

**৩. সামাজিক জীবনে → ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব**

ইসলাম সমাজকে একটি শরীরের মতো দেখেছে — যেখানে এক অঙ্গ কষ্ট পেলে অন্য অঙ্গও ব্যথা পায়। তাই সমাজে প্রকৃত সুখ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার, সহযোগিতা, ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

ধনী-গরিব, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্তের মধ্যে বৈষম্য কমানোর জন্য ইসলাম যাকাত, সদকা ও ওয়াকফের মতো ব্যবস্থা দিয়েছে। এগুলো সমাজে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

রাসুল ﷺ বলেছেন:

**"তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা চায়, তা তার ভাইয়ের জন্যও না চায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৩)**

অতএব, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্বের চর্চাই ইসলামী সমাজে স্থায়ী সুখ ও ঐক্যের ভিত্তি।

**৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে → ন্যায়পরায়ণ শাসন**

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুখ প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব ও সুশাসন। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী একজন আদর্শ শাসক হলো সেই ব্যক্তি, যিনি জনগণের কল্যাণে কাজ করেন, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিচার করেন।

রাসুল ﷺ বলেছেন:

**"ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৩১)**

ন্যায়বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যখন রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে এবং আল্লাহভীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সমাজে প্রকৃত শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপে, বলা যায়—

প্রকৃত সুখ কেবল ব্যক্তিগত চেতনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এক সমন্বিত প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব স্তরে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহর স্মরণ, তাকওয়া ও ন্যায়ের চর্চাই হলো সেই মূল চাবিকাঠি, যা মানুষের অন্তর, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থায়ী সুখ এনে দিতে পারে।

**৫. সমগ্র গবেষণার সারকথা**

- প্রকৃত সুখ হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষ তার স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে, নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।
- দুনিয়ার সুখ কেবল পরীক্ষার উপকরণ, কিন্তু আখিরাতের সুখ চূড়ান্ত পুরস্কার।
- ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাফল্য ও সুখ উভয়ই নিহিত আছে আল্লাহভীতি, নৈতিকতা, ও মানবিকতার চর্চায়।

**চূড়ান্ত বক্তব্য**

সুতরাং, **"মানুষের প্রকৃত সুখ কোথায়"**—এই প্রশ্নের উত্তর হলো:

সুখ সেই হৃদয়ে, যা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত।সুখ সেই জীবনে, যা তাকওয়া ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত;আর সুখ সেই সমাজে, যেখানে ভালোবাসা, দয়া ও ন্যায় একসাথে বিকশিত হয়।

**রেফারেন্স তালিকা**


১.পবিত্র আল কুরআন এর বাণী ও হাদিস শরীফ

২. তাফসীরে ইবনে কাসির

৩. মাদারিজুস সালিকিন

৪. তাফহীমুল কুরআন - আবুল আল মাউদূদী

৫.ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - কুরআন অনুবাদ

৬. সিরাহ: ইবনে ইশাক, ইবনে হাশিম

৭. মোহাম্মদ আসাদ; দ্য ইসলামিক ভিউ অন হ্যাপিনেস

৮. সাইয়্যেদ কুতুব; ফি জিলালিল কুরআন

৯. ইউসুফ আল কারযাভী; আল ইবাদাহ ফি ইসলাম

১০. আধুনিক ইতিহাসবিদ ; W. Montgomery Watt

১১. ইসলামী নৈতিক আলোচনা আল গাজ্জালী, Ihya Ulum Al-Din
১২. আল ফারাবী;Al Madinah al Fadilah
১৩. সামাজিক অর্থনীতি ও ওয়াকফ: Ann K.S. Lambton
১৪. আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত : Seligman(Positive psychology), Kabat-Zinn(Mindfulness)
১৫.ড. হামিদুল্লাহ; Islamic Way Of Life
১৬. Aristotle ; Nicomachean Ethics
১৭. Plato; The Republic
১৮. Socrates
১৯. Jeremy Bentham & John Stuart Mill
২০. Martin Seligman; Authentic Happiness
২১. Ibn Sina( Avicenna)